ওয়েস্টার্ন
জলদস্যু
রওশন জামিল

ওয়েস্টার্ন-১৯
একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

জলদস্যু

রওশন জামিল

স্বাধীনচেতা নির্ভীক এক জেদী মানুষ
অ্যালান ওসমান।
পথের ধারে একদিন স্বর্ণমুদ্রা কুড়িয়ে পেল।
বেচতে গিয়েই পড়লো বিপদে। প্রচণ্ড ক্রোধ
আর তলোয়ারে মারাত্মক দক্ষতা তাকে
নিয়ে গেল চরম দুর্ভোগের শেষ প্রান্তে।
স্বদেশ ইংল্যাণ্ড ছেড়ে পশ্চিমে রওনা দিল সে,
জলদস্যু-অধ্যুষিত সাগর পাড়ি দিয়ে
পৌঁছলো আমেরিকার এক অজানা বিপদসঙ্কুল সীমান্তে।
সেখানে পদে পদে ইনডিয়ান, পিস্তলবাজ
আর খুনে-ডাকাতের ভয়।
পশ্চিমে কীভাবে বসতিস্থাপন শুরু হয়
তার এক শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনী।

ষোল টাকা

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২
শো-রূম : ৩৬/10 বাংলাবাজার, ঢাকা-১

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan ও Banglapdf.net এর সৌজন্যে ।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Group:www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

Website : Banglapdf.net

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

সেবা প্রকাশনী

ওয়েস্টার্ন-এর উনবিংশ বই

জলদস্যু

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

রওশন জামিল

প্রকাশক :

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৮৬

রচনা : বিদেশী কাহিনীর ছায়াবলম্বনে

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আসাদুজ্জামান

মুদ্রণে :

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

যোগাযোগের ঠিকানা :

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-২

দূরালাপন : ৪০৫৩৩২

জি পি ও বক্স নং ৮৫০

শো-রুম :

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০, বাংলাবাজার, ঢাকা-

JALDASHYU

By Raoshan Jamil

জলদস্যু

রওশন জামিল

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

এক

আমার চণ্ডালের মতো ক্রোধই যত দুর্ভোগের কারণ ; এই ক্রোধ আর অস্ত্রচালনায় দক্ষতা জন্মসূত্রে আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছি।

তবে এই দক্ষতা না থাকলে আমাকে হয়তো সে-দিন স্ট্যামফোর্ডের শান-বাঁধানো রাস্তায় রক্তাক্ত দেহে মরে পড়ে থাকতে হতো।

ওই ঘটনার আগে পর্যন্ত স্ট্যামফোর্ডে একটা প্রবাদ চালু ছিলো, গোটা হাওড় এলাকায় অ্যালান ওসমানের চেয়ে ধীর-স্থির কর্মপটু লোক আর একটাও নেই। আমার চেয়ে বেশি ফসল ঘরে তুলতে পারে না কেউ ; এবং এই অঞ্চলের পথঘাট আমি যেমন চিনি, তেমনটা কেউ চেনে না।

কিন্তু একদিন ক্ষণিকের উত্তেজনায় সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল —বদ্বুদের মতো, জলের ওপর প্রখর সূর্যকিরণে কুয়াশার মতো আমার জীবনপ্রদীপও নিভে যাবার দশা হলো।

সেটা পনেরোশো নিরানব্বই সাল। তখনকার দিনে কোনো রাজপুরুষের গায়ে হাত তুলে আমার মতো ছাপোষা লোকের রেহাই পাবার উপায় ছিলো না। বিপদ দ্রুত ধেয়ে এলো আমার দিকে, সহসা, এবং কোনো রকম আগাম হুঁশিয়ারি না দিয়ে

এর সূচনা রিচ-এর কাছে। একদিন ওই পথে আসছি, আচমকা

পা হড়কে নালায় পড়ে গেলাম। নালাটা বেশ বড়, মাইলছয়েক লম্বা। সেচব্যবস্থার প্রয়োজনে বহুকাল আগে আমার পূর্বপুরুষদের কেউ বোধ হয় তৈরি করেছিলেন।

পা হড়কাতেই হাতের তালুতে ভর দিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম যাতে কাপড়ে ময়লা না লাগে। হঠাৎ মনে হলো সামনে চকচকে মতো কী যেন পড়ে আছে। ভালোমত লক্ষ্য করতে দেখলাম একটা স্বর্ণ-মুদ্রা।

স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন আমাদের এলাকায় নেই। আমরা পণ্যবিনিময় করি। সওদাগরেরা অবশ্যি মুদ্রায় মাল বেচাকেনা করে, তবে এ-দিকে তারা বিশেষ আসে না। তাই মোহর দেখে আমার একটু বিস্ময়বোধ জাগলো বৈকি। সামান্য নড়েচড়ে দুআঙুলে মোহরটা তুলে নেবার সময় আরো একটা চোখে পড়লো।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম আমি, তারপর যেন হাতের কাদা সাফ করছি এমনিভাবে মোহরদুটো থেকে ময়লা ঝেড়ে ফেললাম আমার পায়ের কাছেই ছিলো কাদাঘোলা পানি। ওই পানিতে ধুয়ে নিলাম ওগুলো।

পুরোনো, অনেককালের পুরোনো মুদ্রা। ইংরেজ আমলের নয়, খোদাই-করা লেখা বা চেহারা, কোনোটাই পরিচিত ঠেকলো না। প্রথম মোহরটা ভারি, ওজন থেকে অনুমান করলাম দামী; দ্বিতীয়টা অপেক্ষাকৃত ছোট আর পাতলা—গড়নও ভিন্ন ধরনের।

ওগুলো পকেটে পুরে আশপাশে তাকালাম। তখনো সকাল হয়নি পুরোপুরি। ধূসর আকাশ আনত মেঘে ছেয়ে আছে, প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে গতরাতে। নির্জন শান্ত পরিবেশ। রিচ আর উড ডিটনের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আমি। রিচের এক গোলায় পড়শিদের সাথে

কাজ করতে গিয়েছিলাম। ওখানে একটা সরাইখানার আগুনের ধারে রাত কাটিয়েছি। ভোরের আলো ফোটার আগেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। ভেবে দেখলাম অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে, তাই সন্তর্পণে উঠে নালায় নেমেছি। যে-কোনো আবহাওয়াতে ওটাই সহজতম রাস্তা।

এত ভোরে জেলে আর জাহাজীরা ছাড়া খুব কম লোকই বাড়ি থেকে বেরোয়। কিন্তু আমি ছটফটে স্বভাবের মানুষ—বাড়তি আয়ের সুযোগ পেলে হাতছাড়া করি না। ইচ্ছে আছে, হাতে কিছু টাকা জমলে জমি-জিরেত বাড়াবো। এতে সমাজে আমার প্রতিপত্তি বাড়বে।

আমি জহুরি নই, তবে এটা বুঝতে পারছি যে এই সোনার কল্যাণে আমার অবস্থা তাড়াতাড়ি ফিরবে; গতর খেটে সারা বছরে যা কামাতে পারবো, তার চেয়ে এর দাম বেশি হবে। এখন বাবা থাকলে বলতে পারতেন এর এক-একটার মূল্য কত।

ঝুঁকে হাঁটু সাফ করার ভান করলাম, চারপাশে আরো সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাবার সুযোগ পেলাম এর ফলে। চরাচরে কেউ নেই, আমি একা। দূরে উইলো আর ওকের বন। আসন্ন সকালের ক্ষীণ আলোয় সামান্যতম নড়াচড়াও চোখে পড়লো না কোথাও। এ-বার যেখানে পড়ে গিয়েছিলাম, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার আশপাশে নজর বোলালাম। দুটো মুদ্রা যখন পাওয়া গেছে, আরো দু-চারটে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে···

নালার এ-পাশটা ক্ষয়ে গেছে, বৃষ্টির পানিতে মাটি ধুয়ে গিয়ে একটা গর্তমত সৃষ্টি হয়েছে। ওখানে আরেকটা পেলাম। তারপর আঙুল দিয়ে কাদা সরাতেই আরো তিনটে চোখে পড়লো।

আর নেই। কাদার সাহায্যে গর্তটা বুজিয়ে দিয়ে সরে এলাম ওখান থেকে। বারছয়েক পেছন ফিরে দেখলাম কেউ লক্ষ্য করছে কি না, চোখে পড়লো না কাউকে। গর্তে জমে-থাকা বৃষ্টির পানিতে হাত আর মোহরগুলো ধুয়ে নিলাম। ছটা স্বর্ণমুদ্রা—আমার জন্যে এ-ই ঢের।

প্রাচীন মোহর। ছুটো রোমান। যুদ্ধফেরতা কোনো সৈনিক হয়তো এসেছিল এ-দিকে। ছিনতাই হবার আশঙ্কায় মাটিচাপা দিয়েছিল মোহরগুলো। তারপর সে নিশ্চয়ই দস্যুদের হাতে মারা পড়েছে, তাই ওগুলো রয়ে গেছে এখানে। লোকটার গুপ্তধন আজ আমার বরাত খুলে দিলো বলে মনে মনে তার আত্মার শান্তি কামনা করলাম।

স্পষ্ট বুঝতে পারছি এই ছটা স্বর্ণমুদ্রা কোথাও ভাঙাতে নিয়ে গেলে সবাই আমাকে চোর ঠাউরাবে। আমার মতো চাষাভুষো কীভাবে পেলো এই সোনা, তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু করবে। সমাজে ঠগ-বাটপারের অভাব নেই, নানান ফন্দি-ফিকিরে এগুলো তারা হাতিয়ে নেবার চেষ্টা চালাবে।

সম্পত্তি বলতে হাওড়ে অল্প কিছু জমি আছে আমার। যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখানোয় বাবা ওগুলো ইনাম হিশেবে পেয়েছিলেন। তাও এর অধিকাংশই এখন পানির নিচে, সংসারের প্রায় কোনো কাজেই আসে না।

আমার লাগোয়া একটা উর্বর আবাদী জমি আছে। বহুকাল ধরে ওটার প্রতি আমার নজর। বেচতে রাজি হলে এখন আমি কিনতে পারবো ওই জমিটা।

কিন্তু সোনা দিয়ে কিনতে গেলে গাঁয়ে রটনার সৃষ্টি হবে। সুতরাং আর কোনো উপায় ঠাউরাতে হবে।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবছি, হঠাৎ স্ট্যামফোর্ডের এক বৃদ্ধ পণ্ডিতের কথা মনে পড়লো। চ্যাটেরিসের রাস্তায় ওঁর নাম শুনেছি অ্যানটিকসের প্রতি তাঁর নাকি অপার কৌতূহল। কোনো প্রাচীন দেয়াল বা মঠের ধ্বংসাবশেষ দেখার লোভে মাইলের পর মাইল হাঁটতেও আপত্তি নেই। পছন্দসই কিছু পেলে ন্যায্য দামে কিনেও নেন।

ভদ্রলোকের নাম হ্যাসলিং। শোনা যায় পুরাতত্ত্বের ওপরে একটা বইও লিখেছেন। কেমব্রিজে সে-বই পড়ানো হয় সৌম্যদর্শন সদাশয় মানুষ। স্ট্যামফোর্ডে, তাঁর বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম আমি।

বাড়িটা তেমন আহামরিগোছের কিছু নয়, তবে ছিমছাম পরিপাটি। চারপাশ থেকে পাইনবীথি স্নিগ্ধ ছায়া দিচ্ছে। পেছনে ফুলের বাগান, সাত-সকালে পাখির কাকলী ভেসে আসছে।

নক করতে মাঝবয়েসী এক মহিলা এসে দরজা খুললো। মোটামুটি সুন্দরী, মাথায় শাদা ক্যাপ। চেহারায় আইরিশদের আদল আছে। ভোরবেলায় দরজায় নোংরা জামাকাপড়-পরা অচেনা লোক দেখে তার ভ্রূ কুঁচকে গেল।

কভেনি হ্যাসলিংয়ের কাছে ব্যবসায়িক আলাপে এসেছি শুনে প্রথমে কিছুটা সংশয়ভাব দেখা দিলো তার মুখে, তারপর যখন বললাম পুরোনো জিনিসের খোঁজ আছে, হাট হয়ে খুলে গেল দরজা। একটু বাদে মহিলা চা দিলো, তবে চোলাই পেলেই বেশি খুশি হতাম আমি।

ঘরটা কাগজপত্র আর বইয়ে ঠাসা। দেয়ালে পেরেকের সাথে একটা মাথার খুলি টাঙানো। চোখবিহীন কালো অন্ধকার কোটরদুটো কটমট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। পাশেই ঝুলছে একটা ব্রোনজের কুঠার।

কৌতূহলী চোখে দেখছি ওগুলো, এমন সময় ঘরে ঢুকলেন তিনি। সরল হাসি ফুটে আছে মুখে। আমাকে দেখে মাথা ঈষৎ নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'আমার খোঁজ করছিলে, বাবা?'

'হ্যাঁ। অ্যানটিকসে আপনার আগ্রহের কথা শুনে এসেছি।'

'কিছু পেয়েছো নাকি?' শিশুর মতো আত্মহারা হয়ে উঠলেন হ্যাসলিং। 'কী জিনিস? কই দেখি।'

'আগে আপনাকে কথা দিতে হবে এ-ব্যাপারে মুখ খুলবেন না কারো কাছে। আমি কাউকে লাভের বখরা দিতে চাই না।'

'লাভ? লাভের কথা বলছো?' ভৎর্সনা ফুটলো তাঁর কণ্ঠে। 'ইতিহাসের কথা অতীত গৌরবের কথা তোমার ভাবা উচিত।'

'ওগুলো আপনাকে মানায়, চমৎকার বাড়িতে থাকেন। আমি চাল-চুলোহীন মানুষ, লাভটাই আমার কাছে আসল।' উঠে দাঁড়ালাম আমি।

'বসো বসো,' বললেন হ্যাসলিং, 'চটছো কেন? কই দেখি তোমার জিনিস।'

'তাহলে কথা দিচ্ছেন কাউকে বলবেন না?'

'আচ্ছা, বলবো না।'

পকেট থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে ওঁর হাতে দিলাম, আলোয় পরীক্ষা করতে জানালার ধারে গেলেন তিনি। নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, 'বেচতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'আরো আছে, না একটাই?'

আমাকে ইতস্তত করতে দেখে চোখ মটকালেন বৃদ্ধ। 'মুখ খুলতে মানা করেছো, কথা দিচ্ছি খুলবো না।'

'মোট ছটা মোহর। তবে সবগুলো এক জাতীয় নয়।'

'হলেই বরং অবাক হতাম। রোমান বাহিনীতে বিভিন্ন জায়গার লোক ছিলো। তারাও আবার বহু দেশে যুদ্ধ করেছে। ফলে অনেক ধরনের মুদ্রাই ছিলো ওদের কাছে।'

'আর একটামাত্র সঙ্গে এনেছি।'

দ্বিতীয় মুদ্রাটা নিয়ে আবার আলোয় গেলেন তিনি, উলটেপালটে দেখে টেবিলের কাছে ফিরে এলেন।

ঘরটা বেশ বড়। অধিকাংশ আসবাব পুরোনো ঢঙের, হালফ্যাশ-নের বলতে গেলে কিছুই নেই। একধারে বিশাল কাঠের সিন্দুক। অনায়াসে দুজন শুতে পারবে ওর ওপর। দেয়ালের নকশাগুলো শেলডনের আঁকা।

'আরগুলো কোথায়?'

'আগে এই দুটোর ব্যাপারে রফা হোক।'

হ্যাসলিং হাসলেন। 'তুমি তো খুব সাবধানী লোক, বাবা। তোমাকে পছন্দ হয়েছে আমার। নিশ্চয়ই এর কথা বলোনি কাউকে?'

'না।'

'ঠিক করেছো। সোনার প্রতি প্রত্যেকের লোভ আছে। তা, বাবা, আমার পক্ষে তো একটার বেশি কেনা সম্ভব হবে না। তবে আমার এক বন্ধু আছে, তাকে বলে দেখতে পারি। প্রাচীন মুদ্রা জমানো তার শখ।'

মোটা কাঁচা-পাকা ভ্রূর নিচ দিয়ে আমার দিকে তাকালেন তিনি। 'আরেকটু চা দিতে বলি?'

আমি ঘাড় নেড়ে সায় জানাতে মহিলাকে ডাকলেন হ্যাসলিং। এভাবে জলের মতো করে চা খেতে বাধো বাধো ঠেকছে আমার।

এক পাউনড চায়ের দাম দিয়ে পাঁচ একর জমি কেনা যায়। বাবার কাছ থেকে ওই পরিমাণ জমি, একটা কুটির আর আস্তাবল পেয়েছি আমি।

'রোমানদের কথা জানো কিছু?' বৃদ্ধ শুধোলেন।

'জানি। বাবার মুখে শুনেছি। উনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন।'

'সারা পৃথিবী জয় করেছিল ওরা,' বললেন হ্যাসলিং।

'অর্ধেকেরও কম,' আপত্তি জানালাম আমি, বাবার বক্তব্য মনে পড়লো। 'ওরা ক্যাথের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি।'

আমুদে সুরে হাসলেন হ্যাসলিং। 'ঠিক বলেছো। এমনকি কেমব্রিজের অনেকে এ-কথা জানে না। তুমি দেখছি অনেক কিছু জানো।'

আড়চোখে আমাকে দেখে নিয়ে মোহরগুলোর দিকে তাকালেন তিনি।

'তোমার বাবা সৈনিক ছিলেন, না? কী নাম তোমার?'

'অ্যালান ওসমান। এলিতে এই নামে আরো একটা পরিবার আছে, তবে আমরা তাদের কেউ নই। বাবার নাম আইভো ওসমান।'

'আইভো ওসমান! আচ্ছা! তাঁর তো বেশ নামডাক। এখনো তাঁর কথা অনেকে বলে।'

'হ্যাঁ, যুদ্ধে গিয়েছিলেন তিনি।'

'শুধু কি তাই। তোমার বাবা একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ।' আবার আমার দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। 'বাকিগুলো?'

'পরে আনবো। আগে এ-দুটোর দাম পেয়ে নিই।'

পাশের ঘর থেকে হ্যাসলিং বেশ কিছু টাকা এনে দিলেন। 'এই নাও,' বললেন, 'কোনো ভয় নেই। তোমার বন্ধু হলাম আমি। বাকি মোহরগুলো নিয়ে এসো, আমি খদ্দের ঠিক করে রাখবো।'

আলোয় মুদ্রাদুটো তুলে ধরলেন তিনি। 'এগুলো আমাদের ইতিহাসের অংশ। এর সাহায্যেই আমাদের অতীত গৌরবের কথা জানতে পারবো আমরা।'

ইতিহাস কর্মিমানুষের সৃষ্টি। বুদ্ধির প্রয়োজন হয়েছে, কিন্তু কর্মি-হাত না থাকলে কোনোই কাজে আসতো না। প্রাচীন ইতিহাস জানবার আগ্রহ থাকলেও এই মুহূর্তে আমার নিজের ভবিষ্যতের কথাই আমার সারা মন আচ্ছন্ন করে আছে। অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত না হলে শিল্প-ইতিহাস কোনো কিছুই টেকে না।

এখন এই টাকা দিয়ে উইলিয়মের কাছ থেকে ওই লাগোয়া জমিটা কিনতে পারবো। তবে এই সাথে আরো একটা চিন্তা মাথাচাড়া দিলো: এই কি সব? এর চেয়ে বেশি উন্নতি করতে পারবো না আমি?

আমার বাবা ছিলেন সৈনিক; বহু দেশ ঘুরেছেন। প্রায়ই বলতেন, 'খোকা, চাষযোগ্য একটা জমি থাকলে তোকে আর খাওয়ার ভাবনা ভাবতে হবে না।'

শুধু খাওয়াটাই কি সব? এত অল্পে সন্তুষ্ট নই আমি, আরো বড় হতে চাই।

উইলিয়ম খাঁটি লোক। তার ভরসায় জমিজমা রেখে আমি বাইরে কোথাও গেলে ওগুলো সে দেখাশোনা করবে। মার যাবার আশঙ্কা নেই।

এইসব ভাবতে ভাবতে কভেনি হ্যাসলিংয়ের বাসা থেকে বেরিয়ে এলাম।

পথে নেমে খানিকদূর যেতেই বিপদে জড়িয়ে পড়লাম। শহরের এক মেয়ের দিকে চোখ পড়লো আমার। একটা সরাইখানার সামনে

ঘোড়াগাড়িতে বসে আছে মেয়েটা। মনে হলো আমাকে দেখে হাসলো সে। সাথে সাথে আমার মনে খুশির বান ডাকলো। আনন্দ ফুর্তি আমার রক্তে। পকেটে টাকাও আছে প্রচুর, এত যে এক সঙ্গে রোজগার করিনি কখনো, তার ওপর সামনে সুখী ভবিষ্যতের হাতছানি—ফলে স্থানকালপাত্র ভুলে গেলাম।

আমিও হাসলাম ওর দিকে চেয়ে, ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালাম। কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে হবে তাতে সন্দেহ নেই। অমন চমৎকার ঘোড়াগাড়িতে চড়া চাট্টিখানি কথা নয়। ভুলে গেলাম, এদের সাথে যত কম দেখা-সাক্ষাৎ হয় ততই মঙ্গল।

গাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় কানে এলো মেয়েটা বলছে নিচু স্বরে, 'একটু জল খাওয়াতে পারেন?'

এখন কী করবো আমি? সামনের পাতকুয়ো থেকে একটা পাত্রে জল এনে বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে, কিন্তু মেয়েটা নেবার আগেই পেছন থেকে একটা ক্রুদ্ধ থাবা এসে পাত্রটা ফেলে দিলো আমার হাত থেকে।

ঝটিতি ঘুরতেই এক সুদর্শন যুবকের মুখোমুখি হলাম। মাথায় হ্যাট। রাগে লাল হয়ে গেছে তার মুখ।

'ব্যাটা, বদমাশ!' বলেই আমার মুখে বিরাশি ওজনের ঘুসি হাঁকলো সে এ-সব ব্যাপারে আমি পটু, ছেলেবেলায় বাবার কাছে শিক্ষা পেয়েছি, চট করে সরিয়ে নিলাম মাথা। টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল যুবক।

হেসে উঠলাম আমি···মেয়েটাও হাসলো।

শায়িত অবস্থায় আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানলো সে, পরক্ষণেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তলোয়ার বের করলো।

চেঁচিয়ে উঠলো মেয়েটা। 'রুপার্ট, না!' লোকটা ধেয়ে এলো আমার দিকে।

বোঝাই যাচ্ছে, ওর এখন মাথার ঠিক নেই, রাগে কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছে—আমাকে খুন করাই একমাত্র লক্ষ্য।

বাবার শিক্ষা রক্ষা করলো আমায়। আমার সঙ্গে তেল চকচকে বাঁশের লাঠি ছিলো। লাঠিটা দিয়ে ওর হাতে আঘাত করতে তলোয়ারটা পড়ে গেল মাটিতে।

হঠাৎ পাশ থেকে বজ্রমুষ্টিতে আমার হাত চেপে ধরলো কেউ। 'গর্দভ কোথাকার। জানো, ও কে? রুপার্ট গেনেসটারে, আর্ল-এর ভাতিজা।'

দুই

ভিড় একটু পাতলা হতেই সটকে পড়লাম। আমার অনেক দোষ, তবে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি না কখনো। গেনেসটার কেন মারলো আমায় জানি না, আমার মতো একজন অন্ত্যজের স্পর্শ লাগলে পাছে তার প্রিয়ার শরীর অপবিত্র হয়—এই আশঙ্কাতেই বোধ হয়।

লোকটা আঘাত হেনেছে, আমিও পালটা জবাব দিয়েছি। ও পড়ে গেলে হেসেছি, ওর মানসীও বাদ যায়নি। গেনেসটারের জায়গায় হলে আমিও হয়তো খেপে উঠতাম।

কেউ আঘাত করলে ঠেকাতে হবে, ঠেকাতে চাইলে আঘাত করতে হবে—এটাই আমার নীতি : এ আমার স্বভাবগত। পুরো ঘটনাটাই এই নিয়মে ঘটেছে।

দৌড়ুচ্ছি, এমন সময় আমার পাশে চলে এলো এক লোক। 'এই পথে।' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো সে। 'জঙ্গলের ভেতর দিয়ে।'

রাস্তার দুপাশে প্রাচীন বটগাছের সারি। আমাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল লোকটা, ফাঁকা মাঠের প্রান্তে গিয়ে থামলো।

'আমার সঙ্গে ঘোড়া আছে,' বললো সে।

একটা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের ছায়ায় ঘোড়াটা চরছে। কেন এমন নির্জন জায়গায় ওটা লুকিয়ে রেখেছে সে জানতে চাইলাম না। তবে এই প্রথম আমার ত্রাণকর্তার মুখের দিকে তাকালাম।

মাঝবয়েসী দোহারা গড়ন। লম্বা, তবে আমার চেয়ে খাটো। কপালে বলিরেখার ছাপ। কোটরগত কালো চোখ। অচঞ্চল সতর্ক দৃষ্টি ফুটে আছে সেখানে। কোমরে তলোয়ার, কটিবন্ধে একখানা ফ্লোরেনটাইন ভোজালি ওগুলো দেখে এই মুহূর্তে হিংসে হলো আমার

'মোটে একটা ঘোড়া?' জিজ্ঞেস করলাম

তাতে কী। একটার পিঠেই দুজনে চাপবো।'

ওর কথামত ওই ঘোড়ায় চেপে ছুটে চললাম আমরা। পথে কয়েক-বার দিক্‌পরিবর্তন করলাম, এতে পেছনে যদি কেউ লেগেও থাকে খসে পড়বে। কিছুক্ষণ পর লোকটা বললো, 'তোমাকে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে পারছি না বলে খুব খারাপ লাগছে, এখানে কিছুই চিনি না আমি।'

'ও নিয়ে ভেবো না,' আমি বললাম। 'আমার জায়গাটা নিরাপদ।

সেখানে গেলে কেউ আমাদের হদিস পাবে না।'

আমার মাথায় তখন চিন্তার ঝড় বইছে। স্ট্যামফোর্ডে একমাত্র হ্যাসলিং আর তাঁর ঝি-ই আমায় চেনে, তবে ওরা আমার ঠিকানা জানে না। আমাদের গ্রামটা একটু অজ এলাকায়, এইদিককার লোক-জন বিশেষ যায় না ও-দিকে। সুতরাং ওই ঘটনার সময় যারা আমাকে দেখেছে তাদের ভেতর পরিচিত লোক থাকার সম্ভাবনা কম। তবে এরপরেও যদি কেউ চিনে থাকে, কুছপরোয়া নেই, একবার হাওড়ে পৌঁছুতে পারলে আমার টিকিটির নাগালও পাবে না তারা।

বলতে গেলে পুরো অঞ্চলটাই পানির নিচে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে একখানা বিশাল পানির চাদর পাতা আছে বুঝি। কিন্তু কাছে গেলে ভুল ভাঙবে। অসংখ্য ঝোপঝাড়ে ভরা। প্রচুর গাছ। ইচ্ছে করলেই নৌকো নিয়ে গা ঢাকা দেয়া যায়। আশপাশে কয়েকটা দ্বীপও রয়েছে। হাওড় এলাকার লোক ছাড়া ওগুলোর সন্ধান কেউ জানে না।

পাছে কেউ লেগে থাকে এই ভয়ে সোজা পথে এগোচ্ছি না আমরা। গাছগাছালির ভেতর দিয়ে চলার চেষ্টা করছি। কোনো সাক্ষী রেখে যাবার ইচ্ছে আমাদের নেই।

অনেকদূর যাবার পর আহার করতে থামলাম। এই সুযোগে ঘোড়াটাও বিশ্রাম পাবে একটু।

'আমার নাম অ্যালান ওসমান,' বললাম। 'হাওড়ের শেষ-প্রান্তে আমাদের গাঁ। সেখানেই যাচ্ছি।'

'আমি জুবলেন। কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই। শুনেছি আমার পূর্বপুরুষেরা নাকি বহুকাল আগে মেইন থেকে এসেছিলেন এ-দেশে। তোমাকে দেখে মনে হয় সৈনিক। তা কী করা হয় আসলে?'

'চাষাবাদ।'

'তোমার রিফলেকস কিন্তু দারুণ। চমৎকার লড়েছো তুমি, অ্যালান।'

'আরেকটু হলেই ও মেরে ফেলতো আমাকে।'

'ঠিক। ওর চোখে খুনের নেশা জেগে উঠেছিল। ঠাট্টার পাত্র হতে পছন্দ করে না লোকটা। আমি তো ভেবেছিলাম তোমার দফা শেষ।'

জুবলেন তার স্যাডলব্যাগ থেকে রুটি বের করলো। দুভাগ করে একখণ্ড আমায় দিলো। শুকনো খটখটে রুটি, তবে সুস্বাদু।

'আর কিছু নেই,' বললো সে।

'এতেই চলবে। আমার বাসায় গেলে খাওয়ার অভাব হবে না।'

'তোমাকে খুঁজবে ওরা।'

'পাবে না। হাওড় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য জানো না, তাই বলছো। ওখানে এমন গর্তও আছে যার ভেতর একটা আস্ত বাড়ি ঢুকে যাবে, অথচ ওপর থেকে বোঝার জো নেই।'

খানিকটা রুটি ছিঁড়ে মুখে পুরলাম। 'তাছাড়া স্ট্যামফোর্ডের কেউ চেনে না আমায়। বিশেষ একটা দরকারে গিয়েছিলাম।'

'যার কাছে গিয়েছিলে সে মুখ খুলবে না তো?'

'মনে হয় না। লোকটা ভালো। তাছাড়া মুখ বুঁজে থাকার সঙ্গত কারণও আছে।'

আমার দিকে তাকালো জুবলেন, কিন্তু খোলাসা করে বললাম না কিছু। কোনো অচেনা লোকের কাছে, তার ওপর সেই লোকের সাথে যদি আবার তলোয়ার থাকে, কেউই কবুল করবে না যে তার ট্যাঁকে সোনা আছে।

কিন্তু তোমার এই চেহারা, লড়াইয়ের কৌশল...'

'জানে না কেউ, এমনকি আমার বন্ধুরাও নয়। বাসায় যখন কেউ থাকতো না, কেবল তখনই বাবা তালিম দিতেন আমায়।'

'তোমার বাবা সৈনিক ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাই,' অস্ফুট স্বরে বললো জুবলেন। 'তোমার লাঠি চালাবার ঢং দেখেই আঁচ করেছিলাম তুমি সৈনিক।'

'ভুল। আমি কৃষক,' দৃঢ় সুরে বললাম। 'একটা গরু এবং কয়েক একর জমি হলে আর কিছু চাই না।'

'গরু?' ব্যঙ্গ ঝরে পড়লো জুবলেনের গলা থেকে। 'আমি হলে তলোয়ার কিনতাম। তোমার যা রাগ, বাপু, ওটাই বরং কাজে আসবে বেশি।'

'তলোয়ার আছে আমার। তিনটে। কোনোই কাজে আসেনি, দেয়ালে ঝুলছে। বন্দুক পিস্তল—এগুলোও আছে।'

'তুমি কেমনতর চাষী, হে, বাড়িতে অস্ত্রপাতি রাখো?'

'ওগুলো আমার বাবার। যুদ্ধের মাঠে সংগ্রহ করেছেন। একটা পেয়েছেন উপহার হিশেবে, এক নামকরা আর্লের কাছ থেকে।'

'খাসা গপ্পো!'

'সত্যি ঘটনা,' সগর্বে বললাম আমি। 'বাবা না বাঁচালে সে-বার মারা পড়তেন উনি। শত্রুসেনা ঘিরে ফেলেছিল তাঁকে। ওই অবস্থায় নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বাবা তাঁকে রক্ষা করেন। পরে বাবাকে তিনি একটা তলোয়ার আর কিছু সোনা দেন। ওই সোনা দিয়েই আমাদের জমিজমা কিনেছেন বাবা। উনি আরো কিছু দেবার আশ্বাস দিয়েছিলেন, তবে সেটা কী এখন আর আমার মনে নেই।'

'বড়লোকদের ওই এক দোষ। অকাতরে মানুষকে আশ্বাসবাণী

খয়রাত করেন। আবার ভুলেও যান পরমুহূর্তে তবে ওই তলোয়ারটা তুমি সাথে রাখলে ভালো করবে.'

'একজন গেঁয়ো লোকের কোমরে তলোয়ার ঝুলতে দেখলে লোকে হাসবে না?'

'প্রাণে মারা পড়ার চেয়ে লোকহাসানো অনেক ভালো। দোস্ত, তুমি এমন এক লোককে শত্রু বানিয়েছ যে তোমাকে সহজে রেহাই দেবে না। আমার পরামর্শ, তলোয়ারটা সর্বদা তোমার সঙ্গে রাখবে, আর বেশি ঘুমুবে না।'

অনেক বিষয়ে কথাবার্তা হলো আমাদের, তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরের আলো ফোটার আগেই আবার রওনা দিলাম আমরা। কেউ লাগার ভয় আমি করছি না। যে-পথে যাচ্ছি সেটা ভীষণ বিপদ-সঙ্কুল, ডানে-বাঁয়ে বেসামাল পা পড়লেই চোরাবালিতে তলিয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া কাঁটাঝোপের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। নিরাপদ রাস্তাও আছে, তার হদিস জানি কেবল আমরা, হাওড়-বাসীরা। জলের ওপর ঘাস মাথা-জাগিয়ে রেখেছে, পার হলেই ফের সোজা হয়ে যায়। তখন পথের কোনো নামনিশানাও আর থাকে না।

তিনদিন বাদে আমার কুটিরে পৌছুলাম। কুটিরটা একেবারে ছোট নয়: চারটে কামরা, সবগুলোই প্রশস্ত। লাগোয়া আস্তাবলও আছে। চুনাপাথরের গাঁথনি, পুরু খড়ের ছাত।

'চমৎকার জায়গা,' মন্তব্য করলো জুবলেন।

আমি মোমবাতি ধরাতেই দেয়ালে-ঝোলানো তলোয়ারগুলোর দিকে তার চোখ পড়লো। প্রথমটা আর্লের-দেয়া উপহার— সোজা, দুধার, তীক্ষ্ণ ফলা। দ্বিতীয়টা ঈষৎ বাঁকানো। এ-ধরনের তলোয়ারকে বলা হয় সিমিট্যার। নকশাখচিত বাঁট আর সব শেষেরটা ফ্যাল-

শিওন। অনেকটা কাস্তেআকৃতির, চওড়া ব্লেড, অসম্ভব ধারালো।

'হুঁ, মিথ্যে বলোনি তুমি,' স্বীকার করলো জুবলেন। 'জিনিস বটে।'

'শমশেরটা এক তুর্কিসেনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন বাবা, লেপানটোর যুদ্ধে। যুদ্ধেই তাঁর সময় কেটেছে বেশি. ফরাসিদের বিরুদ্ধে সেনট কোয়েনটিন আর ফুটফেন-এর যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন।'

'বেশ লম্বা সময়,' মন্তব্য করলো জুবলেন।

'সতেরো বছর বয়সে যুদ্ধে যান, তিন বছর আগে যখন মারা গেলেন তখনও সেনাবাহিনীতেই ছিলেন। শুনেছি যোদ্ধা হিশেবে তাঁর সুনাম ছিলো।'

ঘরে পর্যাপ্ত খাবার আছে। আলু, তরিতরকারি, পনির, শুটকি মাছ। এক জায়গায় জড়ো করলাম সব, তারপর খাটের তলা থেকে চোলাইয়ের বোতল নিয়ে এসে খেতে বসলাম।

ওর যা খাওয়ার বহর, লড়াইতেও তেমন হলে জুবলেন লোকটা যে একজন ভালো যোদ্ধা সন্দেহ নেই। খেতে খেতে বহু গল্প শোনালো। বেশির ভাগই যুদ্ধের। বাবার কাছেও এ-ধরনের কাহিনী শুনেছি আমি, তবে গল্প বলার পেছনে সব সময় তাঁর একটা উদ্দেশ্য কাজ করতো—এগুলোর সাহায্যে আমাকে শিক্ষা উপদেশ দেয়ার চেষ্টা করতেন। বাবা বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর সময় ফুরিয়ে আসছে, তাই যতটা সম্ভব জ্ঞান দিতে চাইছিলেন আমায়। সর্বদা উপদেশ দিতেন নিরস্ত্র অবস্থায় দূরে কোথাও যেতে নেই। খলপ্রকৃতির মানুষ, বিশেষ করে মেয়েছেলে সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতে বলতেন।

'সময় থাকতে থাকতে আমার কাছ থেকে শিখে নে, অ্যালান,'

বাবা বলতেন। 'মনের জানালা খোলা রাখবি, দেখবি কত সহজে বহু কিছু শিখে ফেলেছিস। তারপর যখন তোর ছেলে হবে, তাকেও শেখাবি।'

'ছেলে নাও-তো হতে পারে।'

'পেতেই হবে। তবে এ-ক্ষেত্রে স্ত্রী নির্বাচনের ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। সাহস শক্তির দরকার রয়েছে, কিন্তু বুদ্ধিও থাকতে হবে। তোর মা আমার চেয়েও বুদ্ধিমতী ছিলো। তোর মাঝে তার ছায়া দেখতে পাই আমি।

'সব ছেলেরই তার পরিবার, দেশের প্রতি কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য থাকে। সুসন্তানের জন্ম দেয়া তার একটা, ওরাই তো ভবিষ্যতের কাণ্ডারি হবে।'

বাবা খুব বলিয়ে লোক ছিলেন, তবে সে কেবল আমার সঙ্গে; অন্যের সামনে মুখ খুলতেন না বিশেষ। যুদ্ধের ঘটনা বলার সময় নিছক বর্ণনাই নয়, এর সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং তাৎপর্যের বিষয়টিও স্থান পেতো।

'যুদ্ধের কলাকৌশল শেখা যায়,' আমাকে বলেছিলেন বাবা। 'তবে প্রাথমিক নিয়মকানুন একবার শেখা হয়ে গেলে বাকিটা নির্ভর করে নিজের ওপরে। এটা শিখিয়ে-পড়িয়ে হয় না, সম্পূর্ণ উপলব্ধি শক্তি উদ্ভাবনী ক্ষমতার ব্যাপার।

'ভালো খারাপ, দুভাবেই আক্রমণ রচনা করা যায়। বুঝতে হবে কখন পরিস্থিতি অনুকূলে নেই, অতএব পিছিয়ে আসা দরকার।

'আগে যে-সব প্রচলিত পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলো শিখে নে, তারপর তোর বুদ্ধি খেলিয়ে নতুন কিছু যোগ করবি।'

জুবলেনকে এইসব বলায় হতভম্বের মতো আমার দিকে সে চেয়ে

রইলো কিছুক্ষণ। 'তোমার বাবা সেপাই ছিলেন? ওঁর তো ক্যাপটেন হওয়া উচিত ছিলো।'

'পদ নিয়ে মাথা ঘামায় অভিজাত লোকেরা। আমার বাবার গায়ে শক্তি ছিলো, তলোয়ারই ছিলো তাঁর সব কিছু। আর কোনো যুগ বা দেশ হলে হয়তো…'

'হুঁ,' আপনমনে মদের গ্লাসে চুমুক দিলো জুবলেন। 'প্রায়ই ভাবি কালাপানি পাড়ি দেবো। পিযারোর মতো একটা সামান্য সেপাই পারলে আমি পারবো না কেন? ও কোনো অভিজাত ঘরের সন্তান নয়। সাহস ইচ্ছাশক্তি আর তলোয়ার ছিলো ওর সম্বল।'

'নতুন দেশে,' একমত হলাম আমি, 'সবই সম্ভব। আমিও ভেবেছি এ-দিকটা। নতুন কোনো দেশে গেলে হয়তো সাফল্যই হবে মূল কথা, বংশ নিয়ে মাথা ঘামাবে না কেউ। নিজের যোগ্যতা না থাকলে নামকরা বংশে জন্মানোর এক কানাকড়ি মূল্য নেই।'

'হ্যাঁ, ভাগ্য সহায় হলে সেখানে রাজা-বাদশাহ্‌ও বনে যেতে পারে কেউ। নর্মান বা তারও আগে স্যাকসনরা যেমন ইংল্যানডে এসে করেছিল, তেমনি সেও হয়তো কিছু জায়গা জয় করে সেখানকার শাসক হয়ে বসবে।'

'রাজা হওয়ার সাধ আমার নেই,' বললাম, 'আমি নিজের ইচ্ছেমত চলতে চাই।'

খেয়ে-ঘুমিয়ে শুয়ে-বসে দুদিন কাটিয়ে দিলাম আমরা। জুবলেনের বিশ্রাম দরকার ছিলো. পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে। আমারও সেই একই দশা, গত কয়েকটা মাস পরের গোলায় কাজ করার ফলে জোরধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে।

কিন্তু সহসা একটা কথা মনে পড়ায় গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল।

মারামারির সময় ভিড়ের মধ্যে একটা পরিচিত মুখ দেখতে পেয়েছি আমি। লোকটার সাথে রিচে এক সঙ্গে কাজ করেছি

রাজ্যের অস্বস্তি ঘিরে ধরলো আমায়। হয়তো আমাকে চিনতে পারবে না সে। তবু···

একবার জুবলেন ঘরের বাইরে গেলে গুপ্তস্থান থেকে বাকি মোহরগুলো বের করে আমার কাপড়ের সেলাইয়ের ভাঁজে লুকিয়ে রাখলাম যে-কোনো সময় পালাতে হতে পারে তাই তৈরি হয়ে রইলাম।

চতুর্থদিন ধাবমান খুরের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তখনও আঁধার কাটেনি পুরোপুরি। বিছানা থেকে নেমে আর্লের তলোয়ারটা পেড়ে আনলাম। ওটা টেবিলের ওপর রেখে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

ভেজা সেঁতসেঁতে বাতাস। ভারি কুয়াশার চাদর গোটা হাওড় মুড়ে রেখেছে। শিশির-ভেজা ঘাস, এই ম্লান আলোয় যতটুকু দেখা যাচ্ছে আরো সবুজ তরতাজা হয়ে উঠেছে।

ফটকের কাছে এসে থামলো ঘোড়া। স্যাডল থেকে নেমে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো সওয়ারি। কভেনি হ্যাসলিং।

ফালতু সময় নষ্ট করলেন না তিনি। 'তুমি বিপদে পড়েছো, বাবা, ভয়ানক বিপদে। তোমাকে চিনে ফেলেছে একজন। কাল সকলে মিলে তোমাকে ধরতে আসছে।'

'আমার জন্যে ভোগান্তি হলো আপনার।'

'টাকার দরকার পড়বে তোমার।' পকেট থেকে একমুঠো খুচরো পয়সা বের করলেন তিনি। 'এগুলো রাখো, পরে শোধ দিলেই চলবে। এখন আমাকে ফেরার রাস্তা দেখিয়ে দাও। ওদের চোখে পড়তে চাই না আমি।'

'দেবো, কিন্তু তার আগে আমার এখানে খেয়ে নিন কিছু।' অনেক

দূর থেকে আসছেন।'

ঘোড়া বেঁধে রেখে আমার সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন তিনি। ইতিমধ্যে জুবলেনের ঘুম ভেঙে গেছে, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে সে।

'আমার ফ্রেনড জুবলেন। পেশায় সৈনিক,' ব্যাখ্যা করলাম আমি। 'আর ইনি আমার সেই বন্ধু। স্ট্যামফোর্ডে থাকেন। আমাকে সাবধান করতে এসেছেন।'

ঘরের চারদিকে ঘুরে হ্যাসলিংয়ের চোখ তলোয়ারটার ওপর এসে স্থির হলো। 'এটাই তাহলে সেই তলোয়ার। তোমার বাবাকে দেয়া আর্লের উপহার?'

'হ্যাঁ।'

'আমিও শুনেছি গল্পটা,' আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন হ্যাসলিং। 'তোমার নাম বলতেই একজন বললেন ঘটনাটা। ভদ্রলোক তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী।'

'কে?'

'ওই তোমার জিনিস যার কাছে বেচতে গিয়েছিলাম। উনি তোমার বাবার বন্ধু।'

'এ্যালানের কিন্তু শত্রুও আছে একজন,' তিক্ত সুরে বললো জুবলেন। 'তার কী খবর?'

'কে, রুপার্ট গেনেসটার? ও একটা আস্ত শয়তান, ক্ষমতাসীন মহলের সাথে খুব দহরম-মহরম। ভীষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তুমি ওকে ঠাট্টার পাত্র করে তুলেছো বলে তোমার ওপর সে বেজায় চটে গেছে।'

খাওয়া সেরে ঘোড়ায় চাপলেন হ্যাসলিং। আমার দেখানো রাস্তা ধরে ফিরতি পথ ধরলেন। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে ওঁর খুরের বিলীয়-

মান শব্দ শুনলাম আমি, তারপর ঘরে গিয়ে কোমরে তলোয়ার আর একটা ছোরা ঝুলিয়ে নিলাম। পিস্তলে গুলি ভরার সময় লক্ষ্য করলাম জুবলেন চেয়ে আছে আমার দিকে, বিদ্রূপের ছাপ ফুটে উঠেছে ওর চোখে।

'এই তো বুদ্ধি খোলতাই হতে শুরু করেছে।' হাতের গ্লাস খালি করলো সে।

আমরা, হাওড়বাসীরা, খুব স্বাধীনচেতা মানুষ। গতর খেটে খাই। আলসে লোকদের মোটেও পছন্দ করি না। আমাদের কেউ কেউ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে, কেউ-বা গেছে নৌবাহিনীতে। তবে বেশির ভাগই খেত-খামার নিয়ে ব্যস্ত।

বহুকাল ধরেই এই এলাকা চোরাচালানীদের স্বর্গ, এখানকার গোপন জলপথে মাল আনা-নেয়া করে ওরা। আমাদের সঙ্গে ওদের কোনো সংশ্রব নেই, তবে মোটামুটি সবাইকে চিনি, পথঘাটের হদিসও জানা আছে।

সিন্দুক থেকে বাবার শিরস্ত্রাণটা বের করলাম আমি, দেয়াল থেকে বাকি অস্ত্রগুলোও পেড়ে আনলাম। তারপর আমার ডিঙি নৌকোতে বেকন, হ্যাম, শুকনো ফলমূল ইত্যাদি বোঝাই করলাম।

বাসার দরজা বন্ধ করতে ফিরে যাচ্ছি। এমন সময় আমার দিকে ছুটে এলো ওরা। মোট ছজন, প্রত্যেকেই সশস্ত্র। ঝট করে তলোয়ার বের করলাম আমি।

'মেরে ফেলো! ওর লাশ দেখতে চাই আমি!'

কথাগুলো কানে গেলেও ভড়কে গেলাম না, লড়ুয়ে হিশেবে আমি খারাপ নই। এক পাশে সরে গিয়ে ওদের একজনের মুখোমুখি হলাম। লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার তলোয়ার ওর পেটে ঢুকে

গেল।

এক ঝটকায় তলোয়ারটা ছাড়িয়ে নিয়ে অন্যদের মোকাবেলা করলাম। ওদের একজন সঙ্গীকে রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়তে দেখে হকচকিয়ে গেল ওরা। একজন গোবেচারা চাষীকে খুন করাই এদের উদ্দেশ্য, নিজেরা মারা পড়তে আসেনি।

ওদের এই বিমূঢ় ভাবকেই কাজে লাগালাম আমি। আরো একটাকে কচুকাটা করলাম। এইবার জড়তা কাটিয়ে উঠলো ওরা। সবেগে তলোয়ার ঘোরাতে লাগলাম আমি, বেশ বুঝতে পারছি এভাবে বেশিক্ষণ টিকতে পারবো না। হঠাৎ পেছন থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো।

'চালিয়ে যাও, দোস্ত, একটাও যেন পালাতে না পারে।'

জুবলেনকে দেখে রণে ভঙ্গ দিলো ওরা। প্রভুর হুকুমের তোয়াক্কা করলো না। এমনিতেই আমার তরফ থেকে কোনো প্রতিরোধ আশা করেনি, তার ওপর আরো একজনকে দেখে ওদের যুদ্ধের শখ মিটে গেল।

শত্রুরা পিঠটান দিতেই ডিঙির উদ্দেশে ছুট দিলাম আমরা। ওদের তিনজন অক্কা পেয়েছে, আহত হয়েছে একজন। আমাদের পেছন থেকে একটা ক্রুদ্ধ গলা ভেসে এলো:

'তোর পরিচয় এখন আমি জানি। কোথাও পালাতে পারবি না তুই।'

লোকটা রুপার্ট গেনেসটার।

তিন

আমাদের অনেকের যা ধারণা, হাওড় এলাকা কিন্তু আদৌ ততটা বিশাল নয়, তবু এটাই আমাদের কাছে মনে হয় আদিগন্ত সীমাহীন। এই জলাভূমি আমাদের খুব প্রিয়। একদা যে-নিবিড় বনে ইংল্যানড পরিকীর্ণ ছিলো, তার ছিটেফোঁটা এখনো রয়ে গেছে এই অঞ্চলে।

রোমানরা জলাভূমি পুনরুদ্ধারের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল, এই লক্ষ্যে হাওড়ে পানি নিষ্কাশনও শুরু করেছিল। কিন্তু ওরা চলে যাবার পর স্যাকসনরা তা বন্ধ করে দিলে গোটা অঞ্চল আবার ডুবিয়ে যায়।

শুনছি রানী বেস নাকি এ-ব্যাপারে অভিজ্ঞ এক ডাচ প্রকৌশলীর সাথে সম্প্রতি আলোচনা করেছেন। এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, জলাভূমি ফিরে পেলে আমাদের অনেকেই বড়লোক হয়ে যাবে। যেমন, আমি। পৈতৃক সূত্রে মাত্র কয়েক একর আবাদী জমি পেয়েছি, কিন্তু সরকারি অনুদান বলে হাওড়ের দুবর্গমাইলেরও বেশি জায়গা আমার। পানি নিষ্কাশিত হলে ওই উর্বর জমি নিঃসন্দেহে আমাকে ধনী বানিয়ে দেবে।

কিন্তু আমি এখন পলাতক আসামী। বিচার হলে হয়তো রায় আমার অনুকূলেই যাবে। কখনো কখনো এ-ধরনের মামলায় সাধারণ

মানুষও জেতে, কিন্তু তার হার এতই কম যে ওতে আমার আস্থা নেই। কেন যেন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা আদৌ আদালত পর্যন্ত গড়াবে না, তার আগেই গেনেসটারের ক্ষমতাশালী হাতের ইশারায় কারাগারেই খুন হয়ে যাবো আমি।

একনাগাড়ে বৈঠা বেয়ে চলেছি, আচমকা জুবলেনের অধৈর্য ডাকে হুঁশ ফিরলো। 'কী ব্যাপার, পথ হারিয়ে ফেলেছো নাকি? সেই থেকে খালি চক্কর কাটছো।'

'তা কাটছি,' হেসে ওর কথায় সায় দিলাম 'তবে হারিয়ে যাইনি।'

ঘাসে পানিতে ঘন কুয়াশা জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। আমার বৈঠার শব্দ ছাড়া কোনো আওয়াজ নেই, এবং তাও দুফুট দূর থেকে শোনা যাবে না।

এখন যেখানে যাচ্ছি, ছেলেবেলায় আমি সেখানে খেলাধুলো করতাম। প্রায় তিন একরের একটা আইলেট, অসংখ্য আঁকাবাঁকা খাল চলে গেছে ভেতর দিয়ে। দ্বীপে বেশ কিছু বার্চ ট্রি আর প্রাচীন শাখাবহুল ওক গাছ রয়েছে। সেখানে পৌঁছে একটা গুপ্ত খালের ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম ডিঙিটা, প্রায় শফুট গিয়ে একটা পুরোনো মরা গাছের গুঁড়ির গায়ে ভেড়ালাম। মোটা কাছি দিয়ে বাঁধলাম ডিঙিটা।

মালপত্র নিয়ে চুনাপাথর আর গাছগাছালির ভেতর দিয়ে সরু পথ ধরে একটা গুহায় গেলাম। পনেরোশো ফুট উঁচু একটা চুনাপাথরের পাহাড়ের গায়ে গুহাটা অবস্থিত। সেখানে ছোটমত কুঁড়ে রয়েছে একটা। ওটাও চুনাপাথরের।

'এটা আমার,' বললাম আমি।

'তুমি বেশ সেয়ানা লোক,' বললো জুবলেন।

'চামচিকে, ইঁদুর থাকতে পারে। ওদের তাড়াতে হবে,' বললাম।

তবে তার আর প্রয়োজন হলো না। বরাবরের মতো শুকনোই আছে কুঁড়েটা। একটা টেবিল, দুটো চেয়ার, দুটো ভারি চৌকি, একটা বেনচ আর ফায়ারপ্লেস ছাড়াও ঘরে একটা দেয়াল আলমারি রয়েছে।

খড়কুটো দিয়ে আগুন ধরালাম আমি। এতে ঠাণ্ডাভাবটা দূর হবে। 'বহু প্রাচীন জায়গা,' বললাম, 'রোমানদের ভয়ে হাওড়বাসীরা এখানে এসে লুকাতো।'

'ধরাও পড়তো বলে মনে হয় না,' মন্তব্য করলো জুবলেন। 'এখানে ঢোকার রাস্তা জানতে হলে খোদ শয়তানের সাগরেদি করতে হবে।'

আপাতত আমরা নিরাপদ তবে চিরকাল হাওড়ে লুকিয়ে থাকার ইচ্ছে আমার নেই, বিশেষ করে পকেটে যখন অঢেল টাকা রয়েছে। গত কদিনের ঘটনাবলী আমার নিজের জীবন সম্পর্কে নতুন করে ভাববার সুযোগ করে দিয়েছে আমাকে।

অন্ধকার নদীতে দাঁড় বাইবার ফাঁকে ফাঁকে ভাবনাচিন্তা করার যথেষ্ট সময় পেয়েছি, আমার চিন্তাধারা এখন নতুন খাতে বইতে শুরু করেছে।

'দিনকতক এখানে ঘাপটি মেরে থাকবো,' জুবলেনকে বললাম, 'তারপর লনডনে যাবো।'

'লনডন? খেপেছো? ওটা গেনেসটারের শক্ত ঘাঁটি।'

'লনডন বিরাট শহর,' শান্ত গলায় আমি বললাম। 'শুনেছি ওখানে এক লাখের ওপর লোকের বাস। এত মানুষের ভিড়ে আমায় খুঁজে বের করবে কীভাবে?'

'তুমি এখনো শিশু রয়ে গেছো,' রাগত সুরে বললো জুবলেন। 'গা ঢাকা দেবার মতো যথেষ্ট বড় নয় জায়গাটা, বিশেষত তোমার ওপর যেখানে একজন ক্ষমতাবান লোকের রোষ পড়েছে।'

'কিছু টাকা আছে আমার কাছে,' বললাম, 'কাজেই এই হাওড়ে পচে মরার ইচ্ছে আমার নেই। বাকি জীবনটা আমি মাছ ধরে আর শিকার করে কাটিয়ে দিতে চাই না।'

'তাহলে চলো যুদ্ধে যাই। বলা যায় না, আমাদের কপাল খুলেও যেতে পারে।'

'হুঁ, তারপর কানা-খোঁড়া হয়ে যাই আরকি। না, বাপু, বাজি আমি একটা ধরবো, তবে সেটা আমার জীবন নয়—পণ্য নিয়ে।'

'ব্যবসায়ী হতে চাও?'

'হ্যাঁ, মাল কিনে আমেরিকায় চালান দেবো। গসনলড, বারথলমিউ গসনলড নামে এক লোক কলোনি গড়তে যাচ্ছেন ওখানে। ভদ্রলোকের বাড়ি সাফোকে। তাঁর মতে, ইনডিয়ানদের সঙ্গে ব্যবসা করলে প্রচুর লাভ হবে।'

'বাহ্!' ঝাঁঝ ফুটলো জুবলেনের স্বরে। 'ওখানে কী আছে তার নেই ঠিক, খালি ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন। স্প্যানিশরা লাভবান হয়েছে বটে, কিন্তু ওরা যেখানে গেছে তার উত্তরে কেবল অসভ্যদের বাস। পুরোপুরি জঙ্গল, ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা।'

'কিন্তু ফার মেলে,' বললাম।

'এখানেই বরং সুখে থাকবে তুমি,' ও বললো। 'শুধু শুধু মাথা গরম করে নিজের জীবনটা মাটি করো না।'

'হ্যাঁ, মাছ পশু-পাখি এখানে ভালোই পড়ে,' স্বীকার করলাম, 'এবং ইচ্ছে করলে চোরাকারবারও করা যায়।'

'কিন্তু তা তুমি করতে চাও না?' বাঁকা সুরে মন্তব্য করলো জুবলেন।

'সর্বদা মানি চাই না মানি, আইনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। আইন ছাড়া মানুষ আর মানুষ থাকে না—পশু হয়ে যায়।'

ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিরুপায়ের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো জুবলেন। 'নাহ্, তোমার সাথে কথায় পারার জো নেই। ঠিক আছে, লনডনই সই। তবে মনে রেখো শহরটা ছোট, এবং তোমাকে খোঁজা হচ্ছে।'

বাইরে নিয়মিত তলোয়ার প্র্যাকটিস করছি আমরা। জুবলেন উঁচু মানের যোদ্ধা, এমন অনেক কৌশল জানে যেগুলো আমার অজানা। তবু শিগগিরই উপলব্ধি করলাম ওকে বহু কিছু শেখাতে পারি আমি। স্বেচ্ছায় নিজের দক্ষতা চেপে রাখলাম, ওর বন্ধুত্ব আমার কাছে বেশি মূল্যবান ওকে বাগে আনা মুশকিল --বদমেজাজি, বিশ্বনিন্দুক, সব কিছুতেই ঠাট্টা না করলে ওর খাওয়া যেন হজম হয় না। যুদ্ধ, ভ্রমণ, আকণ্ঠ সুরাপান আর যৌনসুখ ছাড়া কিছু বোঝে না। নিজের অজ্ঞতা আড়াল করে ওর কাছ থেকে নতুন নতুন কৌশল শেখার চেষ্টা করতে লাগলাম।

আমার কল্পনায় এক লাখ লোক জনারণ্য বিশেষ। লনডন এবং আমাদের মাঝে রয়েছে অসংখ্য পড়োজমি আর জলাভূমি। রাস্তা বলতে আছে কেবল মেঠো পথ। সেগুলো আবার চোর-ছ্যাঁচড়ে পরিপূর্ণ।

এ-সব কথা আমি বাবার কাছে শুনেছি। এখানে-সেখানে খামার আর জমিদারীও আছে কয়েকটা।

যাতায়াতের সহজতম উপায় নদীপথ, কিন্তু তাতে ঝকমারি অনেক।

'সাগর পাড়ি দেবো আমরা,' বললাম আমি।

'এখানে জাহাজ পাচ্ছো কোথায়?' কাঠখোট্টা গলায় শুধোলো জুবলেন।

'বসটন থেকে খুব একটা দূরে নেই আমরা, ওখানে জাহাজ ঘাট

আছে। তবে আমাদের বোধ হয় অতদূরে না গেলেও চলবে। আমরা নিনে থেকে চড়বো।'

ফায়ারপ্লেসে লাকড়ি পোড়ার শব্দ হচ্ছে, আগুনের তাপে ছোট্ট ঘরটার সেঁতসেঁতে ভাব দূর হয়ে গেছে। দীর্ঘক্ষণ আগুন জ্বালিয়ে রাখার মতো পর্যাপ্ত কাঠও জোগাড় করে রেখেছি।

'গুপ্তধন খোঁজার শখ থাকলে,' আমি বললাম, 'সমুদ্রতীরে যাও। রাজা জনের সোনাদানা ওখানেই হারিয়ে গেছে। যদ্দূর জানি, ওগুলো আজো ওখানেই আছে, এখন পর্যন্ত কেউ তার হদিস পায়নি। রাজা জনও কাউকে কিছু বলে যেতে পারেননি, ওই ঘটনার অল্পকাল পরেই তিনি মারা যান।'

'ওই জহরতের কথা আমিও শুনেছি। পেলে কিন্তু দারুণ মজা হতো!'

'ফালতু খাটুনির মধ্যে যেও না। এতদিনে ওগুলো হয় কাদামাটির গভীরে তলিয়ে গেছে নয়তো স্রোতের টানে সাগরে ভেসে গেছে। আমার ধারণা ঘটনাচক্রে একদিন হয়তো ওই সোনাদানা পাওয়া যাবে, তবে এখনো তার ঢের দেরি আছে।'

কয়েক টুকরো হ্যাম কেটে ভাজার জন্যে কড়াইতে ফেললাম আমি। ঘরটা বেশ গরম হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে, বাইরে কুয়াশার পর্দা এখনো পাতলা হয়নি—মনে হচ্ছে আরো কদিন এমন যাবে।

'লনডনের রাস্তাঘাট চেনো তো?'

'মোটামুটি। গোটা কয়েক সরাইখানা আছে, তবে একটু ভালো-ভাবে থাকতে চাইলে সৈন্যদের বউরা যে-সব ঘর ভাড়া দেয় সেখানে যেতে হবে। সাউথওঅর্ক এবং লনডন ব্রিজের মাঝামাঝি, ট্যাবার্ডে এইরকম ঘর মেলে।'

'চমৎকার। তাহলে ওই কথাই রইলো, তিনদিনের ভেতর রওনা হচ্ছি।'

লনডনে যাবার পরিকল্পনা আমার বহু দিনের। ওখানে গেলে অনেক কিছু জানতে-শিখতে পারবো, তাছাড়া আমেরিকার ব্যাপারেও খোঁজখবর নেয়া যাবে। দরকার হলে গসনলডের সঙ্গেও সরাসরি কথা বলতে পারবো।

প্রথমেই চাই কয়েকপ্রস্থ নতুন পোশাক। এখন যেগুলো পরে আছি সেগুলো লনডনের মতো শহরে চলাফেরার উপযোগী নয়। তবে এইসব চিন্তাভাবনার ফাঁকে ফাঁকে আরো অনেক প্রসঙ্গ ভিড় করলো আমার মনে। আবার কখনো কি ফিরে আসবো এখানে? গেনেসটারের ভয়ে পালাচ্ছি না তো?

না। আমার মনের সাথে নানাভাবে বোঝাপড়া করে দেখলাম সেখানে কারো প্রতি ভয়ের লেশমাত্র নেই। গেনেসটারকে নিয়ে আদৌ ভাবছি না আমি, আমার নিজের উন্নতিসাধন ছাড়া আর সব কিছুই আমার কাছে গৌণ।

বাবা আমাকে লড়াইয়ের বহু কৌশল শিখিয়েছেন। আমার লেখাপড়ার ব্যাপারে দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন। ভব্যতা শিখিয়েছেন। এমন জ্ঞান আর শিক্ষা দিয়েছেন যা আমাকে ভদ্রসমাজে মিশতে সাহায্য করবে সে-সব কি এখানেই মাটি করবো? এতদুর করেছেন বাবা, এখন এগিয়ে যাবার দায়িত্ব আমার নিজের।

'তোমার ভবিষ্যৎ নিয়েও একবার ভাবো, জুবলেন,' বললাম। 'চিরটা কাল তুমি সেপাই আর আমি দীনহীন হাওড়বাসী হয়ে থাকবো এমন দিব্যি তো কেউ দেয়নি। আমি চাই একদিন আমার নামডাক হবে, জমিদারী হবে।'

প্রচ্ছন্ন হাসি দেখা দিলো ওর ঠোঁটে, বিদ্রূপের ঝিলিক মারছে। 'তোমার সব আকাশকুসুম স্বপ্ন। অতীতে বহুবার এ-সব শুনেছি আমি।'

'আমি পারবো, জুবলেন।'

চিন্তিতভাবে আমার দিকে তাকালো সে। 'তোমার কথাই বোধ হয় ঠিক। বিশ্বের অনেক নামজাদা পরিবারই গায়ের জোরে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছে।'

'আমিও একটা বংশের গোড়াপত্তন করবো,' বললাম, 'তবে তলোয়ার দিয়ে নয়।'

কাঁধ ঝাঁকালো জুবলেন। 'যাই করো, বাপু, তলোয়ারটা হাতের কাছে রেখো। কাজে দেবে।'

চার

সাউথওঅর্কের যে-সরাইখানায় আমরা উঠলাম সেটা একটা পুরোনো নড়বড়ে বিশাল দালান। সামনে বড় উঠোন, দোতলায় ছসারি বারান্দা। নিচের বড় ঘরটা পানশালা—সর্বদা ভিড় লেগেই থাকে, সবাই বেশ হাসিখুশি অমায়িক—পাশেই খাবার ঘর।

জুবলেনের সঙ্গে দরজিবাড়ি গিয়ে নতুন জামাকাপড় কিনলাম, ওকেও উপহার দিলাম একপ্রস্থ।

'এই রেটে খরচ করলে ফতুর হয়ে যাবে,' আমাকে হুঁশিয়ার করে দিলো সে। 'ব্যবসার ইচ্ছে থাকলে মাল কেনার জন্যে টাকা লাগবে তোমার।'

ওর কথায় নিঃসন্দেহে যুক্তি আছে, কিন্তু আমার মাথায় ইতিমধ্যে অন্য চিন্তা ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে। ওই সন্ধ্যেয় হ্যাসলিংকে চিঠি লিখলাম।

> পুরাতত্ত্ব নিয়ে আলাপ করতে চাইলে দু-একদিনের ভেতর ট্যাবার্ডে চলে আসুন।

তলায় কোনো সই দিলাম না। হ্যাসলিং ছাড়া পুরাতত্ত্বের ব্যাপারে আমার আগ্রহের কথা কেউ জানে না। ওই চিঠির সূত্র ধরে আমাকে খুঁজে বের করার মতো কোনো ফাঁক চোখে পড়লো না বটে, তবু খুঁতখুঁত করতে লাগলো মন। পোশাকে আশাকে ফুলবাবুর মতো দেখালেও গেনেসটারকে আমার ধূর্ত বলেই মনে হয়েছে।

জুবলেন আর আমাকে দেখে এখন আর কেউ গেঁয়ো বলবে না। এই ভদ্রলোকের সাজে আমরা যেখানে খুশি যেতে পারবো, তবে পানশালাতেই হরেক খবর মেলে বলে প্রথম দিনটা সেখানেই কাটালাম।

'গসনলড?' আমার এক সাদামাঠা প্রশ্নের জবাবে উত্তর এলো। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমেরিকাতেই যাচ্ছেন। রাণীর সনদও আছে ওঁর কাছে। সঙ্গী হতে চাইলে গিয়ে দেখা করো। মিঃ নিউপোর্টও যাচ্ছেন।

'আরো অনেকে যাচ্ছে, ওদের সম্পর্কে সাবধান। বিশেষ করে ক্যাপটেন গ্যারি লিনেকার···ব্যাটা জলদস্যুরও অধম। দিনদুয়েকের মধ্যেই ওর জাহাজ ছাড়বে। লোকটাকে একটুও বিশ্বাস নেই, চশমখোর।

'ওর দলের লোকগুলোও এক-একটা হাড় বজ্জাত এ-যাত্রায় কজনের মাথায় যে কাঁঠাল ভাঙবে, খোদাই জানে।'

'একান্তই যদি যেতে চাও তুমি,' জুবলেন বললো, 'গসনলড কিংবা নিউপোর্টের কাছে যাও। ওয়েসাউথ ফিরলে তাঁর সঙ্গেও দেখা করতে পারো। এরা প্রত্যেকেই খাঁটি ভদ্রলোক।'

কিন্তু আমার চিন্তা তখন আরেক খাতে বইছে। প্রাচীন জিনিসের প্রতি হ্যাসলিংয়ের আগ্রহ দেখে নতুন আইডিয়া এসেছে মাথায়। তাছাড়া ওই মুদ্রাগুলো এত তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়ে যাওয়ায় বুঝতে পারছি, বাজারে এর চাহিদা আছে। এখন চাই এমন একজন লোক যার দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ, এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে এ-সব সংগ্রহ করতে পারবে।

পুরোনো জিনিসপত্র কারা কেনে কথাচ্ছলে জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'আছে,' জানালো এক গরু ব্যবসায়ী, 'এদের একটা সংঘই আছে। প্রাচীন কোনো মুদ্রা বা অস্ত্র হাতে এলে রীতিমত সেমিনার বসিয়ে দেয় তার ওপর।'

এটাও আয়ের একটা রাস্তা হতে পারে আমরা যতটা চিনি, ভদ্রলোকেরা পুরোনো বা চোরাইমালের ঘাঁটি ততটা চেনে না। টুকটাক জিনিস কিনতে এইসব জায়গায় গিয়েছি আমি জানি কোথায় কোনটা পাওয়া যায়

তখন এগুলোর প্রতি আমার কোনো আগ্রহ ছিলো না এখন দেখছি একটু বিদ্যে আর পকেটে কিছু টাকা থাকলে এ থেকে টু পাইস কামানো যায়।

মনে পড়লো বাবা একবার বলেছিলেন, ইংল্যান্ডের ইতিহাস লেখার মালমসলা জোগাড়ের জন্যে এক লোক তাঁর জীবনের প্রায়

পুরোটা সময় দেশময় চষে বেড়িয়েছেন। তখন এমন বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ তাঁর চোখে পড়েছে যেগুলোর খবর আগে কেউ জানতো না। বাবার সাথে তাঁর পরিচয় ছিলো। ভদ্রলোকের নাম, আমার মনে পড়লো, জন লিল্যানড।

আমার জন্মের আগে উনি মারা গেছেন, ইতিহাস রচনা আর হয়ে ওঠেনি, তবে যে-সব টীকাভাষ্য সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলো কেমব্রিজে সংরক্ষিত আছে। ওর একটা কপি জোগাড় করতে পারলে আমার কাজ সহজ হয়ে যাবে।

পানশালায় ধূর্ত চেহারার এক লোককে আমার চোখে পড়েছে। লক্ষ্য করেছি আমি ঢুকলেই সে পরিহাস-তরল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। কেন জানি ওকে মনে ধরলো। ড্রিংকসের প্রস্তাব দিয়ে ভাব জমানোর চেষ্টা করলাম।

হাসিমুখে প্রস্তাব গ্রহণ করলো সে। আমি বললাম, 'তোমাকে দেখে মনে হয়, দেশের অনেক খবরই রাখো।'

'তা এক-আধটু রাখি বৈকি,' স্বীকার করলো সে।

'লিল্যানডের নাম শুনেছো? ইংল্যানডের ইতিহাস লেখার জন্যে উনি কতগুলো নোট তৈরি করেছিলেন। আমি তার কপি সংগ্রহ করতে চাই।'

'কপি?' এক পলক আমার দিকে তাকিয়ে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লো লোকটা। 'এ-ব্যাপারে আমি একদম আনাড়ি।' একঢোকে গ্লাসের তলানিটুকু গলায় ঢেলে যোগ করলো, 'তবে একজনের কথা জানি, তাকে এই লাইনের বিশারদ বলতে পারো। উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে যে-কোনো লেখা কপি করে দেবে।'

'দোস্ত, আরেক গ্লাস খাও তুমি,' বললাম, 'চাইলে অন্য কিছুও

নিতে পারো। তা ওর নাম কী?'

খানিক ইতস্তত করে সে বললো, 'সেনট পলস ওঅক চেনো?'

'আমি চিনি,' বললো জুবলেন।

'দলিল লেখকদের একটা আড্ডা আছে ওখানে। ওই আড্ডাতেই পাবে ওকে।'

'বলো, কী খাবে? মদ না খানা?'

লোকটার সব কটা হলদে দাঁত বেরিয়ে পড়লো। 'মদ, তবে সঙ্গে একটু মাংস হলে মন্দ হয় না।'

খাবারের অর্ডার দিয়ে আবার ঘুরলাম ওর দিকে। 'লোকটার নাম?' জিজ্ঞেস করলাম।

'পিটার টালিস।'

বাইরে এসে চোখ পাকিয়ে আমার পানে তাকালো জুবলেন। 'তুমি একটা গাধা। কয়েকটা মামুলি টীকাভাষ্যের পেছনে এভাবে পয়সা খরচ করে কেউ?'

'স্রেফ দেখে যাও,' উৎফুল্ল সুরে বললাম আমি।

সেনট পলস ওঅককে লনডন শহরের হৃদপিণ্ড বললে মোটেও বাড়াবাড়ি হবে না। আসলে ওটা একটা বিশাল ক্যাথেড্রালের মূল অংশ, তবে পূণ্যার্থীদের ভিড় নেই—গির্জায় সুদখোরদের ঢুকতে না দেয়ার ব্যাপারে যীশুর নির্দেশ অমান্য করে ক্যাথেড্রালের ডীন সুদের কারবারী, দলিল লেখক, ঠগ-বাটপার আর মক্কেল-ঠকানো উকিলদের বসতে দিয়েছেন এখানে। তাঁরও দুপয়সা আয় হচ্ছে ফাঁকতালে।

টালিস মধ্যবয়েসী লোক, কপালের কাছে চুলে পাক ধরেছে। আমার প্রয়োজনের কথা শুনে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো সে। নিঃশব্দ হাসি ছড়িয়ে পড়লো মুখে। 'হ্যাঁ, অ্যাদ্দিনে একটা নতুন

কাজ পেলাম বটে। কোনো চিন্তা নেই, হয়ে যাবে, তবে দশ শিলিং লাগবে।'

দরাদরি করে নয় শিলিংয়ে রফা হলো। 'এক হপ্তা পর আসবো আমি,' বললাম।

'নয় শিলিং!' ফেরার পথে খ্যাক করে উঠলো জুবলেন। 'তোমার কি টাকার খনি আছে নাকি, হে? জীবনে চোখেও দেখোনি এমন জিনিসের পেছনে নয় শিলিং খরচ করতে গায়ে এতটুকু বাধলো না!'

'একে তুমি একধরনের জুয়া বলতে পারো,' খোলামেলা উত্তর দিলাম। 'আমার এখন বন্ধু দরকার, কিন্তু সবেধন নীলমণি তুমি। টাকা দরকার, এবং বিশ্বাস করো, তার একটা রাস্তাও পেয়ে গেছি।'

'পেলেই রক্ষে,' হাল ছেড়ে দিয়ে বললো জুবলেন 'তবে দুহাতে উড়াচ্ছো তুমি।'

সঙ্গে যা টাকা এনেছিলাম তার প্রায় সবটাই ফুরিয়ে এসেছে। হপ্তাশেষে বাকিটাও যাবে। অবশ্যি আমার কাছে এখনো চারটে স্বর্ণমুদ্রা অবশিষ্ট রয়েছে পথচলতি বিভিন্ন দোকানে গিয়ে প্রাচীন মুদ্রার দাম করলাম। কিনেও ফেললাম দুটো— একটা ব্রোনজের, অন্যটা রুপোর।

'শোনো,' সরাইতে ফিরে এসে আরেকদফা তর্ক জুড়লো জুবলেন, 'জেনারেল এসেকস এখন আয়ারল্যানডে রয়েছেন। যুদ্ধ করতে পারে এ-রকম লোক দরকার তাঁর। আমরা বরং···'

'আয়ারল্যানডের সাথে আমার কোনো শত্রুতা নেই। ইচ্ছে হলে তুমি যেতে পারো। আমি আমেরিকাতেই যাবো এবং বড়লোক হয়ে ফিরে আসবো।'

'যেতে বললেই তো আর যাওয়া যায় না। তুমি আমার বন্ধু,

অ্যালান। ঠিক আছে, দেখি তোমার এই পাগলামি কোথায় গিয়ে ঠেকে।'

'ঢের হয়েছে। গ্লোবে নাটক হচ্ছে, চলো দেখে আসি। গাঁয়ে যাত্রা ছাড়া আর কিছু দেখিনি আমি।'

'গেলে তলোয়ারটাও সাথে নাও,' পরামর্শ দিলো জুবলেন। 'প্রায়ই মাস্তানরা গোলমাল পাকায় হলে।'

টালিসের খোঁজ যার কাছে পেয়েছিলাম, রওনা হবার সময় তার প্রতি নজর পড়লো আমার। লোকটা কাজের সন্দেহ নেই। ওকেও ডেকে নিলাম। কথায় কথায় সে জানালো তার নাম করনিভো। আগে সার্কাসের ক্লাউন ছিলো। পড়ে গিয়ে মাজায় ব্যথা পায়, সেই থেকে কাজ ছেড়ে দিয়েছে। এখন দিনমজুরি করে চলছে।

'এখানে একটা পুরাতাত্ত্বিক সংঘ আছে,' ওকে বললাম, 'ওদের কাউকে চেনো?'

'চিনি।'

আমার বর্তমান প্ল্যানটা তেমন জটিল নয়। এলিজাবেথের রাজত্বে কেউ সফল হতে চাইলে তার সাহস আর শক্তি দরকার, এবং এগুলো না থাকলে চাই খুঁটির জোর। আমি খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অথচ রাজ-দরবারে পরিচিত কেউ নেই, ওই দুনিয়ায় ঢোকার ইচ্ছেও আমার নেই। নিজের অবস্থা ফেরাতে যতটুকু দরকার তার বেশি কিছু আমি চাই না, কিন্তু সে-জন্যেও প্রয়োজন সুযোগ। বড় মানুষদের সাহায্য ছাড়া ওটা মেলে না।

স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কার এই যোগাযোগের পথে একটা ধাপ। আমেরিকার স্বপ্ন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কেন জানি মনে হচ্ছে, ওখানে অপার সৌভাগ্য অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। তবে সেখানে

যেতে হলে টাকা লাগবে, কিন্তু বাবার শেষ-ঠিকানাটুকু বেচতে চাই না। প্রাচীন মোহরগুলোর কল্যাণে একটা আলোর সন্ধান পেয়েছি, বুঝতে পেরেছি বাজারে এর কদর আছে।

হ্যাসলিং মহৎ লোক, তাই খাতির করেছেন আমাকে। অন্যেরা তা নাও দেখাতে পারে—সে-জন্যেই এই ভদ্র বেশভূষা।

চলার পথে বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আমার চোখে পড়েছে। তবে শুধু ওইগুলোর ওপর ভরসা করলেই চলবে না, লিল্যানডের টীকা-ভাষ্যের সাহায্যও নিতে হবে। মূল্যবান কোনো জিনিস পেয়ে গেলে আমার মূলধনটা জোগাড় হয়ে যাবে। তাছাড়া এই কেনাবেচার সূত্রে কোনো নামীদামী লোককে ধরে একটা জাহাজের চাকরিও জুটে যেতে পারে।

নিজের জীবনটাকে আমি ভাগ্যের হাতে সঁপে দিতে চাই না, ভাগ্যকে নিজের হাতে গড়তে চাই।

পাঁচ

পরিস্থিতি এবং উত্তরাধিকার একটি স্থূল বস্তুর জন্ম দিয়েছে; এই বস্তুটি হচ্ছি আমি। অবশ্যি আমার শিক্ষা-দীক্ষা অধিকাংশ হাওড়বাসীর চেয়ে উন্নত। এবং তার-পুরো কৃতিত্ব আমার বাবার।

যে-থিয়েটারে আমরা গেলাম, সেটা একটা ডিম্বাকৃতির দালান,

মাথার ওপর ছাত নেই। দেয়ালগুলো কাঠ দিয়ে মোড়া। নিচ থেকে ওপরে থাক থাক গ্যালারি উঠে গেছে। ছপেনি, দুপেনি, এমনকি একপেনির টিকিটও আছে। এক তলায় নিচুশ্রেণীর লোকেরা বসে। ঝড়-জল হলে তার ঝাপটা ওদেরকেই সইতে হয়।

ভালো থিয়েটারও আছে কয়েকটা, কিন্তু উইলিয়ম শেকসপীয়র বা এই জাতীয় নামকরা নাট্যকারদের জনপ্রিয়তা মুলত শ্রমিকশ্রেণী এবং তরুণ সমাজের কাছে বলে সস্তা রঙ্গমঞ্চেই অভিনীত হয় এঁদের নাটক।

থিয়েটার শুরু হতে দেরি আছে এখনো, দর্শকরা বাইরে গুলতানি মারছে, কেউ কেউ বাদাম বা রুটি চিবুচ্ছে। আমরা ব্যালকনিতে বসলাম। নিচ থেকে একজন অশ্লীল মন্তব্য ছুঁড়ে দিলো জুবলেনের দিকে। সেও পালটা লাগসই জবাব দিলো। আমাদের পাশেই তিন-জন গুণ্ডাপ্রকৃতির ছোকরা বসেছে। দেখে মনে হয় ভালো ঘরের বখে-যাওয়া সন্তান। আপেল বাদামের খোসা নিচের দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে ওরা, এবং একতলায় যারা বসেছে তারা আবার সেগুলো ফেরত পাঠাচ্ছে ওদের কাছে।

একটা পেটমোটা পিপে রাখা আছে নিচতলার এক কোণে। বেশি মাতাল হয়ে পড়লে যাতে বমি করতে পারে সে-জন্যেই ওই ব্যবস্থা। বমির উৎকট গন্ধে জায়গাটা ভরে গেলে একজন চেঁচিয়ে বললো, 'জুনিপার জ্বালাও।'

আরো অনেকে সমর্থন করলো তাকে। একজন দ্বাররক্ষী তখন একটা প্লেটে করে জুনিপারের কয়েকটা ছোট জ্বলন্ত ডাল নিয়ে এলো। অল্পক্ষণের ভেতর জায়গাটা পোড়া জুনিপারের কটুগন্ধে ছেয়ে গেল।

হল ভরে গেছে, লক্ষ্য করলাম আমরা। 'শেকসপীয়র খুব জন-

প্রিয়,' জুবলেন জানালো। 'জুলিয়াস সীজার তাঁর সেরা নাটকগুলোর একটা।'

নাটক সম্পর্কে আমার জ্ঞান সীমিত, শেকসপীয়র সম্বন্ধে কিছুই জানি না। ফ্লেচার আর মারলোর নাম শুনেছি।

নাটক আরম্ভ হচ্ছে হঠাৎ আমার পেছন থেকে একটা কর্কশ গলা ভেসে এলো : 'ওই যে! ধর ওকে!'

চকিতে ঘুরতেই রুপার্ট গেনেসটারকে দেখতে পেলাম, পেছনে কঠিন চেহারার জনাছয়েক লোক।

আচমকা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো করনিভো, সিট টপকাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ওদের সামনে। ওর চালাকিতে মওকা পেয়ে গেলাম আমি। রেলিং টপকে দোতলায় লাফিয়ে পড়লাম, সেখান থেকে নিচে।

এ-রকম একটা অভাবনীয় ঘটনায় দর্শকদের মাঝে হট্টগোল শুরু হলো, একজন মহিলা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। ওপরে ক্রুদ্ধ চিৎকার আর গালাগাল চলছে শুনতে পেলাম, পরক্ষণেই দরজা দিয়ে বাইরে চলে এলাম আমি।

রাত নেমেছে। কয়েক কদম দৌড়ে ডানের একটা গলিতে ঢুকে পড়লাম, কিছুদুর গিয়ে আবার ডানে মোড় নিয়ে রাস্তায় উঠলাম। এ-বার গতি কমিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম ; করনিভো ঠিক সময় লাফিয়ে পড়ায় এ-যাত্রা বেঁচে গেছি আমি। এখন কোথায় যাবো? ওরা কি জানে আমি ট্যাবার্ডে উঠেছি? খুব সম্ভব না, তবে একবার যখন জেনে গেছে আমি শহরেই আছি তখন ওটাও জানতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম কী করবো। ঠাণ্ডা

জ্বাকিয়ে বসছে। ঝিরিঝিরি বরফ পড়তে শুরু করেছে এরই মধ্যে।

আমি বরাবর দৃঢ়চেতা মানুষ, ওটাই আমার জন্যে যথার্থ রাস্তা। অদূরে, অন্ধকারের ভেতর একটা বিশাল অট্টালিকার কাঠামো চোখে পড়লো। একই সীমানার ভেতরে ছোট ছোট আরো কয়েকটা দালান দেখে মনে হলো ওই বাড়ির মালিক নিশ্চয়ই কোনো কেউকেটা লোক।

ধীর পায়ে জল-কাদা মাড়িয়ে আমি ওই দিকে এগিয়ে গেলাম। ফটক খুলে ভেতরে পা রাখতেই কয়েকটা ভয়ালদর্শন কুকুর তেড়ে এলো।

পাথরের মতো জমে গেলাম আমি, বাসায় কেউ আছে কি না চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। এক মিনিট পর ঝনাৎ করে শেকল খোলার আওয়াজ পেলাম, তারপর হুড়কো নামানোর শব্দ হলো। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে মোমবাতি হাতে একটি মেয়ে উঁকি দিলো।

'এই, ব্রুনো। চুপ কর!'

গলা শুনে মনে হলো যুবতী। শান্ত নম্র সুরে বললাম, 'ম্যাডাম, আপনার কুকুরগুলোকে দয়া করে ডেকে নিন। এমনিতেই ঘোর বিপদে পড়েছি আমি।'

'কে আপনি?'

মহিলার দিকে এগিয়ে গেলাম, কুকুরগুলো আমার পা শুঁকছে, একটা তো একেবারে গা ঘেঁষে রয়েছে। 'একজন হতভাগ্য পর্যটক। কয়েকজন গুণ্ডা আমাকে আক্রমণ করেছিল।'

অবিশ্বাস করার মতো কিছু ছিলো না আমার বক্তব্যে। লনডন শহরে সন্ধ্যের পর এমন হরহামেশাই হয়।

'অতিকষ্টে পালিয়ে এসেছি আমি। কিন্তু এখন লনডন ব্রীজে

ফেরার রাস্তা চিনতে পারছি না।'

ইতিমধ্যে আমি আলোকিত এলাকায় চলে এসেছি। আমার সম্ভ্রান্ত বেশভূষা দেখে মেয়েটি বোধ হয় সন্তুষ্ট হলো। 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

একপাশে সরে দাঁড়ালো সে, টুপি খুলে ভেতরে ঢুকলাম আমি। ওর পেছনেই আরেকজন অল্পবয়েসী মেয়েলোক দাঁড়িয়ে আছে, নিশ্চয়ই এ-বাড়ির ঝি, দারুণ স্বাস্থ্য—দেখলেই ভয় জাগে। আমার পানে কটমট করে তাকালো সে।

অন্য মেয়েটি, মোমবাতি ধরে আছে যে বয়েসে আমার চেয়ে বছরকয়েকের ছোট হবে···অপূর্ব সুন্দরী।

'আপনাদের বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত,' আমি বললাম, 'আমাকে রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেই চলবে।'

'এত রাতে একাকী যেতে পারবেন না,' বললো মেয়েটি। 'লিলা, এঁর জন্যে শোবার একটা ব্যবস্থা করে দাও।'

লিলা আপত্তি তুলতে যাচ্ছিল, অন্য সময় হলে ওর এই মনোভাবকে সাধুবাদ দিতাম, কিন্তু ও মুখ খোলার আগেই প্রথমা একপর্দা গলা চড়িয়ে বললো, 'লিলা, আশা করি আমার কথা শুনতে পেয়েছো তুমি।'

দুপদাপ করে পা ফেলে চলে গেল লিলা। আমাকে পথ দেখিয়ে একটা বড় ঘরে নিয়ে গেল মেয়েটা। ভারি ভারি দামী আসবাবে ঘরটা পরিপাটি করে সাজানো। 'আপনি কিছু খাবেন নিশ্চয়ই? আমার বাবা এখানে থাকলে তিনিও এ-কথাই বলতেন।'

মুখে স্বস্তির ভাব ফুটিয়ে তুলে বললাম, 'দিন।'

একটা ছোট গ্লাসে পানীয় ঢেলে আমাকে দিয়ে সরে দাঁড়ালো সে।

'আপনার ?'

'আমি খাই না, স্যার।'

স্যার সম্বোধনে ভেতরে ভেতরে বিষম খেলেও আমার সবগুলো ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠলো সহসা। এই জায়গা সম্পর্কে কিছুই জানি না আমি, এমনও তো হতে পারে যে খুনে-ডাকাতের ডেরায় ঢুকে পড়েছি।

পরক্ষণেই ভুল ভাঙলো। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভদ্রঘরের মেয়ে, আদরে বেড়ে উঠেছে, মুখের কোথাও রুক্ষতার ছাপ নেই। আর আমার কাছেও তলোয়ার আছে।

'আমার নাম অ্যালান ওসমান।'

'আমি রেবেকা টমাস।'

নামটা মাত্র গতকালই শুনেছি। ওর বাবা নামী লোক। ভেনিস, কনসট্যানটিনোপল এবং কৃষ্ণ সাগর এলাকায় ব্যবসা-সূত্রে প্রচুর অর্থ উপায় করে হালে দেশে ফিরেছেন। এই মুহূর্তে আমেরিকায় যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। আমার সব পরিকল্পনা এ-লাইনেই আবর্তিত হচ্ছে বলে ওর কথায় মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। মিঃ টমাসের সাথে দেখা হলে আমার স্বপ্ন হয়তো সফল হতে পারে।

ব্র্যানডির গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে অনেক কথা হলো ওর সাথে। ইচ্ছে করেই ধীরে ধীরে খাচ্ছি, মেয়েটার সঙ্গ ভালো লাগছে। লনডন সম্পর্কে ওর জানাশোনা তেমন নয়, ফলে ওই সন্ধ্যেয় জনসন, মারলো, শেকসপীয়র এবং উইল কেমপ সম্বন্ধে যে-সব কথা জেনেছি, সেগুলোই ফিরে বললাম ওকে। আর এভাবে নিজেকে একজন সব-জান্তা হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বেগ পেতে হলো না আমার।

ও শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলে লিলা শোবার ঘরটা দেখিয়ে

দিলো।

'আমার ঘুম পাতলা,' সাবধানবাণী উচ্চারণ করলো লিলা, আমি হাসিমুখে ওর দিকে তাকাতে কেটে কেটে যোগ করলো, 'খুব পাতলা।'

'আমারও তাই,' বললাম। 'তোমাদের উটকো ঝামেলায় ফেলে দিয়েছি, না?'

রাতে বিশেষ ঘুম হলো না, জানালায় ভোরের আলো ফুটতে শয্যা ত্যাগ করে স্নান সেরে কাপড় পরে নিলাম। চুপি চুপি চলে যাবো, নাকি আতিথেয়তার জন্যে গৃহস্বামীকে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত ভাবছি এমন সময় দরজায় মৃদু করাঘাত হলো।

লিলা। 'মালিক নাস্তা খেতে বসেছেন। আপনাকেও যেতে অনুরোধ করেছেন.' ও জানালো।

ক্যাপটেন ব্রায়ান টমাসকে দেখলেই শ্রদ্ধাবোধ জাগে মনে। একমাথা পাকা চুল, মুখে ঘন কালো চাপ দাড়ি। নীল শীতল চোখজোড় দিয়ে আমাকে একনজর মাপলেন তিনি, তারপর ইশারায় বসতে বললেন।

'গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছিলে? তলোয়ার ব্যবহার করলে না কেন?'

'ওরা দলে ভারি ছিলো, তাছাড়া আমার বন্ধুদের কাছ থেকে ছিটকে পড়েছিলাম।'

ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকালেন ক্যাপটেন, একটু বাদে, আমি আসন নেবার পরে, কঠিন সুরে বললেন, 'আমিও ছিলাম ওই থিয়েটারে, তুমি যেখানে লাফিয়ে পড়েছিলে তার ঠিক পাশের বকসেই বসেছিলাম।'

'গোটা ব্যাপারটা অল্পকথায় বোঝানো সম্ভব ছিলো না আমার পক্ষে,' বিব্রতভাবে বললাম, 'আর আপনার মেয়েও ভয় পেয়ে যেতো?'

'রেবেকা,' শান্ত গলায় জবাব দিলেন তিনি, 'সহজে ঘাবড়ে যাবার

পাত্রী নয়। মালাবার উপকূলে আমার পাশে দাঁড়িয়ে জলদস্যুদের সাথে লড়েছে। ওরা আমাদের জাহাজে ওঠার চেষ্টা করছিল।'

এ-বার সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকালেন টমাস। 'রুপার্ট গেনেসটারের মতো একটা ইতরের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?'

মিথ্যে বলে কোনো ফায়দা হবে না, আর ইনিও বোকা নন। যতটা সম্ভব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলাম আমি।

'আচ্ছা, আইভোর ছেলে তুমি। ওর নাম শুনেছি। তা তুমি কী করো, বাবা?'

'চাষাবাদ। বাবার কাছে তলোয়ার চালনাও শিখেছি।'

'বেশ বেশ।' উৎসাহী হয়ে উঠলেন ক্যাপটেন। 'তবে এই শয়তান-গুলোকে এড়িয়ে চলা উচিত তোমার, হেন কাজ নেই যা ওরা করতে পারে না।' একটু থেমে কী যেন খুঁজলেন আমার মুখে, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তা লনডনে ফিরতে চাও তুমি?'

'হ্যাঁ। ওই যে বললাম একজনের সাথে দেখা করার কথা আছে।'

'কার কাছে বেচবে মোহরগুলো? দেখি, কী রকম জিনিস?'

শার্টের গুপ্ত পকেট থেকে চারটে স্বর্ণমুদ্রা বের করে টেবিলে রাখলাম।

আঙুল দিয়ে আগ্রহভরে ওগুলো নেড়েচেড়ে দেখলেন তিনি। 'বাহ্...সুন্দর তো!' আলোয় নিয়ে খোদাই-করা লেখাগুলো পড়তে চেষ্টা করলেন। 'আমি কিনবো,' বললেন টমাস।

'কিন্তু আমি যে কভেনি হ্যাসলিংকে কথা দিয়েছি,' মৃদু স্বরে আপত্তি জানালাম।

'মন খারাপ করো না, হ্যাসলিং এতে অসন্তুষ্ট হবেন না। তাছাড়া আমরা দুজনেই একই লোককে উপহার দেবো এগুলো।'

'ওই ভদ্রলোককে চেনেন আপনি ?'

'হ্যাঁ। আসলে ইংল্যানড খুব বড় দেশ নয় তো, মোটামুটি একই পেশায় রয়েছে এমন লোকদের পরস্পর চেনাশোনা আছে। আমি নিজে অবশ্যি পুরাতাত্ত্বিক সংঘের মেম্বার নই, তবে ওদের সকলকে চিনি। হ্যাসলিংয়ের এই বন্ধুর রাজদরবারে প্রতিপত্তি আছে। ওঁকে দিয়ে আমি একটা কাজ করিয়ে নেবো।'

'এইমাত্র না বললেন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় আছে আপনার ?'

ক্যাপটেন হাসলেন। 'উনি তোমাকেও চেনেন। এঁকেই যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার বাবা রক্ষা করেছিলেন। ওই ঘটনার কথা অনেকেই জানে, ওসমান।

'এই আর্ল একজন মহৎপ্রাণ ব্যক্তি। তোমার বাবার উপকারের কথা ভোলেননি। বস্তুত তাঁর একক প্রচেষ্টাতেই ঘটনাটা এত বেশি প্রচার পেয়েছে। সমাজে ওঁর দারুণ প্রভাব, উনি ইচ্ছে করলেই তোমার বরাত খুলে দিতে পারেন।'

'তাহলে তো ভালোই হয়, কিন্তু...'

'কিন্তু কী ?'

'আমি জানি আপনি আমেরিকায় যাচ্ছেন। আপনার সঙ্গে আমি যেতে চাই, ক্যাপটেন। ছোটখাটো ব্যবসা করার ইচ্ছে আছে আমার।'

'ব্যবসা ? কী ব্যবসা ?'

'এই টুকিটাকি কিছু।'

প্রাণখুলে একচোট হাসলেন তিনি। তারপর উঠে দেয়াল-আলমারি থেকে একটা বোতল বের করলেন। 'এসো, গলা ভেজানো যাক।'

'না, এখন থাক, ধন্যবাদ।'

ক্যাপটেনের হাসি মিলিয়ে গেল। প্রত্যাখ্যাত হতে অভ্যস্ত নন

তিনি। 'আচ্ছা, তুমি যখন বলছো, থাক তাহলে,' শ্রাগ করে বললেন নিজের গ্লাস ভর্তি করে আবার এসে বসলেন। 'ঠিক আছে, কেনা-কাটা সেরে ফেলো। দিন পনেরোর মধ্যে জাহাজ ছাড়বে। তুমিও যাবে তাতে।'

'দুজন বন্ধুকে নিলে আপত্তি আছে?'

'লড়তে পারে?'

'পারে।'

'তাহলে ওরাও যাবে, ওসমান।'

আমি উঠে দাঁড়াতে উনি করমর্দন করলেন আমার সাথে। আস্তাবল থেকে ক্যাপটেনের একটা ঘোড়া বেছে নিয়ে লনডনের উদ্দেশে রওনা হলাম আমি। এতক্ষণ বেশ নিরাপদ বোধ করছিলাম, এখন আবার রাজ্যের দুশ্চিন্তা এসে ভর করলো ঘাড়ে।

সব কিছুই যেন অতিসহজে সমাধা হয়ে গেল—এটাই ভীষণ পীড়া দিতে লাগলো আমাকে।

লনডন ব্রীজের কাছাকাছি এসে তলোয়ারের বাঁটে হাত রাখলাম।

ছয়

ট্যাবার্ডে পৌঁছে লাগাম টেনে ধরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারপাশে নজর বোলালাম। সন্দেহজনক কাউকে চোখে পড়লো না দেখে উঠোনে গিয়ে উঠলাম।

জুবলেন বেরিয়ে এলো কলঘর থেকে, পেছনে করনিভো। 'তোমার কপাল খুব ভালো, হে। কেমন সুন্দর কেটে পড়লে।'

'এর পুরো কৃতিত্ব করনিভোর পাওনা। কেউ এসেছে নাকি?'

'সে-ক্ষেত্রে আমরা রাস্তায় অপেক্ষা করতাম তোমার জন্যে। আড়-চোখে ঘোড়াটা লক্ষ্য করলো জুবলেন। 'কোত্থেকে চুরি করলে?'

'এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে ধার নিয়েছি। ওঁর লোক পরে নিয়ে যাবে এসে। আরো আছে,' স্যাডল থেকে নামতে নামতে বললাম, 'আমাদের যাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছি। টমাসের জাহাজে।'

'সত্যিই তুমি ভাগ্যবান,' বিড়বিড় করে বললো জুবলেন। 'কিন্তু তোমার জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে, খুব সহজেই কাজগুলো সমাধা হয়ে যাচ্ছে।'

আমারও যে এই একই আশঙ্কা হচ্ছে সেটা আর জানালাম না ওকে। 'তা হোক, মাল কিনে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।'

সেই রাতে ঘুমুনোর আগে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার অবস্থান

খতিয়ে বিচার করলাম। সম্প্রতি রিচার্ড হ্যাকলিডের লেখা একটা নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে। আমেরিকায় যাত্রার ব্যাপারে ওতে নানান তথ্য রয়েছে। বইটা কিনবো আমি, নৌ-চার্ট পাওয়া গেলে তাও নেবো। কদিন আগে লনডনের কাছেই যে-ধ্বংসাবশেষটা চোখে পড়েছে সেটার কথাও ভাবলাম। আমাকে কাজের সন্ধানে বহু জায়গায় ঘুরতে হয়, আমার অধিকাংশ আবিষ্কারই এভাবে হয়েছে। বেশির ভাগ লোক মাটির তলায় কী আছে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। নিজের আগ্রহ আর বাবার মন্তব্যই এ-বিষয়ে আমাকে সচেতন করে তুলেছে কিন্তু এখন যেটার কথা বলছি সেটা কোনো কাজ করতে গিয়ে খুঁজে পাইনি।

তখন সন্ধ্যে উতরে গেছে, হাঁটতে হাঁটতে বহুদূরে চলে এসেছি আমি, রাতটা কাটানোর জন্যে কাছেপিঠে মাথা গোঁজার মতো ঠাঁই খুঁজছি। হঠাৎ পেছনে খুরের শব্দ পেলাম।

রাতের বেলায় নির্জন স্থানে অপরিচিত লোকের সাথে দেখা হওয়াটা সব সময় সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়, পিছিয়ে গিয়ে একটা ওক গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম আমি।

একটু বাদে ছুটো ষণ্ডামার্কা লোক পাশ কাটিয়ে চলে গেল। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসার সময় পা পিছলে গর্তে পড়ার জোগাড় হলো আমার। বহুকষ্টে একটা ডাল আঁকড়ে ধরে পতন রোধ করলাম তারপর উঠে বসলাম ধীরে ধীরে।

কান পেতে বুঝলাম চলে গেছে ওরা। ঘুরে অন্ধকারের মাঝে দেখার চেষ্টা করলাম, কিছুই চোখে পড়লো না ওটা সত্যি গর্ত না সমতল ভূমি, বোঝার জন্যে মাটি থেকে পাথর কুড়িয়ে নিলাম। ওই আঁধারেও স্পর্শ থেকে টের পেলাম আসলে ওটা কোনো পাথর নয়—

টালি বা মোজাইক জাতীয় একটা কিছু হবে।

উবু হয়ে যেখানে পা হড়কে গিয়েছিল সেখানে হাত রাখলাম। একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে ছুঁড়ে দিলাম সে-দিকে মনে হলো দু-তিন ফুট নিচে পড়লো ডালটা। চারপাশে হাত বোলাতে টালির মেঝে ঠেকলো।

পলকে সিদ্ধান্ত নিলাম, আজ রাতে আর কোথাও যাচ্ছি না। একটা ছোট গর্ত করে খড়কুটো দিয়ে আগুন ধরালাম। এক টুকরো পনির আর রুটি দিয়ে রাতের খাওয়া সেরে ভোরের অপেক্ষায় রইলাম।

সারা রাত ঘুম হলো না, ভোর হতেই আমার হাতের লাঠিটা দিয়ে আশপাশ ভালোমত খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করলাম। সামান্য চেষ্টায় আরো কয়েকটা ভাঙা টালি বেরিয়ে পড়লো। এতে ভীষণ উৎসাহিত বোধ করলাম আমি। খানিক বাদে কয়েকটা ভাঙা-চোরা পটারি আর একটা হাত-ভাঙা মূর্তি চোখে পড়লো।

এখন আমি সেই জায়গায় ফিরে যেতে চাইছি। আরো কিছু মূল্য-বান জিনিস পাবার সম্ভাবনা আছে ওখানে।

পরদিন খুব সকালে পানশালায় গেলাম। চোলাইয়ের গ্লাস সামনে রেখে চুপচাপ বসে লোকজনের কথাবার্তা শুনতে লাগলাম। নানান বিষয়ে আলাপ হচ্ছে, আয়ারল্যানড যুদ্ধে লোকভর্তির ব্যাপারটাই গুরুত্ব পাচ্ছে বেশি।

কয়েকজনের সাথে ব্যবসায়িক আলাপ জুড়লাম আমি। আমেরিকায় যে-সব জিনিস নিয়ে যাবো—পুঁতির মালা, ধারালো ছুরি, সুঁচ, কয়েক গাঁট ছিটকাপড়—সেগুলোর দামদস্তুর করলাম। নিতান্ত কাজে আসবে এমন জিনিসই নেবো আমি, বাড়তি বোঝা বাড়াবার ইচ্ছে

নেই। পশ্চিমে সমুদ্রযাত্রায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কয়েকজন লোকের সঙ্গে আলাপ হলো।

ওদের মধ্যে একজনের বাড়ি ব্রিসটলে। আমেরিকা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে সে বললো, 'বহুকাল থেকে আমরা মাছ ধরতে যাচ্ছি ওইদিকে। প্রায়ই নিউ ফাউনড ল্যানড কিংবা মূল ভূখণ্ডের উপকূলে নামি। অসভ্যদের বাস ওখানে। কোনো সোনা চোখে পড়েনি আমাদের। পাথুরে বা বালুময় দূরবিস্তৃত উপকূল দেখতে পেয়েছি, তার পেছনে নিবিড় জঙ্গল।'

এই ধরনের লোকদের কথা শুনলে রোমাঞ্চ জাগে মনে। ক্যাপটেন টমাসের সঙ্গেও কথা হলো। মালের ফর্দে আরো দু-একটা জিনিস যোগ করে তিনি বললেন, 'আমাদের সময় বেশি নেই। প্লিমাউথে সে-দিন এক জাহাজের ক্যাপটেনের মুখে শুনলাম, স্পেনের সম্রাট শিগগিরই আমাদের বিরুদ্ধে বিরাট নৌবহর পাঠাচ্ছেন। ওরা এসে পড়ার আগেই যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে।'

'আপনার জাহাজে অস্ত্র নেই?'

'অস্ত্র? হ্যাঁ, আছে। কিন্তু ছটা কামান একটা নৌবহরের বিরুদ্ধে কতটুকু কী করতে পারবে বলো? না, না। আমি ঠিক করেছি রাতের বেলায় চুপ করে সরে পড়বো। অতএব সব সময় তৈরি থাকবে যাতে খবর পাওয়ামাত্র রওনা হতে পারো।'

ইতস্ততভাব দেখা দিলো টমাসের মাঝে, দাড়িতে হাত বোলালেন। 'আরেকটা ব্যাপার। গ্যারি লিনেকার নামে কাউকে চেনো?'

'নাম শুনেছি? একটা আস্ত ডাকাত বলে?'

'হ্যাঁ। শয়তানের ধাড়ী, জলদস্যু। আমার জাহাজের পাশেই নোঙর ফেলেছে ব্যাটা। ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার। এর

আগেও বারদুয়েক আমাকে ঝামেলায় ফেলার চেষ্টা করেছে। খালি ফিকির খুঁজছে, কীভাবে আমার চালান লুট করবে।'

আঙুল দিয়ে টেবিলে তাল ঠুকলেন তিনি। 'আমেরিকা সম্বন্ধে জানো কিছু?'

'হ্যাকলিডের বইখানা পড়েছি, আর সব ভাসা ভাসা কথাবার্তা।'

অনেকের চেয়ে বেশি জানো তুমি। স্প্যানিশরা ওদের বসতির নাম দিয়েছে ফ্লোরিডাই। কয়েক ঘর ফরাসিও ছিলো, কিন্তু স্প্যানিশরা ওদের হয় তাড়িয়ে দিয়েছে কিংবা খুন করেছে। গ্রেনভিল প্রায় শ-খানেক লোক নিয়ে গিয়েছিলেন। মাত্র পনেরোজনকে নিয়ে কোনো-মতে পালিয়ে এসেছেন। অন্যরা লাপাত্তা। সন্দেহ নেই, ইনডিয়ান অথবা স্প্যানিশের হাতে মারা পড়েছে।'

'কিংবা কোথাও হয়তো আটকে রেখেছে।'

'ইনডিয়ানদের ব্যাপারে তোমায় সতর্ক থাকতে হবে, অ্যালান। এই ব্যবসা করছে তোমার সঙ্গে, আবার মনোভাব বদলে গেলে হামলা করতেও দ্বিধা করবে না। প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রাখে, কিন্তু ওদের স্বাজাত্যবোধ খুব প্রবল।

'সম্পত্তি সম্পর্কে কোনো ধারণাই ওদের নেই। মানে আমাদের মতো নয় আরকি। সংসারের টুকিটাকি জিনিস প্রত্যেকের কাছেই আছে। চাহিদা আছে এমন জিনিস চোখে পড়লে কেনে।

'তবে সব চেয়ে জরুরি কথা যেটা, সোনা নিয়ে মাথা গরম করবে না কক্ষনো। স্প্যানিশরা অবশ্যি মেক্সিকোতে সোনার খোঁজ পেয়েছে, কিন্তু ফরাসিরা কোথাও পায়নি। ফার, চামড়া, উৎকৃষ্টমানের মুক্তো, মাছ, পটাশ এগুলোর বিনিময়ে সোনা পাওয়া যায়। পটাশের ভালো বাজার আছে।'

'আমি কী ধরনের মাল আনবো?'

'ফার। তোমার মূলধন কম, সুতরাং ভেবেচিন্তে এগোবে। শুধু ফার কিনবে, এবং সেরা জিনিসটা নেবে একবার দুনম্বর মাল নিলে সব সময় তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। ইনডিয়ানরা বোকা নয়। বার্টার পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেই ওরা বেঁচে আছে, জানে নিজেদের চাহিদা।'

'শেয়ালের চামড়ায় নকশা তোলার পুঁতি নেই যদি?'

'নিতে পারো। ওই চামড়া ওদের প্রচুর আছে, কিন্তু আমাদের মতো হরেক রকমের পুঁতি নেই। চাহিদা রয়েছে অথচ সরবরাহ কম এমন জিনিসের দাম বেশি পাবে। নিজের চাহিদা অনুযায়ী মাল কেনো তুমি, ইনডিয়ানরাও তাই করে।

'ভালো ছুরির কদর আছে। গাদা বন্দুকও কিনতে চাইবে, কিন্তু দিও না। একবার যদি অস্ত্রেশস্ত্রে আমাদের সমান হতে পারে ওরা, তো আর রক্ষে নেই।'

'মাথায় বাড়ি দেবে?'

'আলবত। ফরাসিরাও তাই। সমুদ্রে কোনো জাহাজকে বিশ্বাস করবে না। সুযোগ পেলেই তোমার সর্বস্ব লুট করবে।'

ইশারায় আমাদের গ্লাস আবার ভরে দিতে বললেন তিনি। 'প্রথমে আমরা দক্ষিণে যাবো, প্রায় স্প্যানিশ উপনিবেশগুলোর কাছাকাছি, তারপর উত্তরের উপকূল ধরে এগোবো। সবশেষে উত্তর উপকূলের কোনো দ্বীপে গিয়ে ফেরার প্রস্তুতি নেবো।'

নিজের গ্লাস উঁচু করলেন টমাস, ঘন পাকা ভ্রূর নিচ দিয়ে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। 'জানো, স্ট্যামফোর্ডের ওই ঘটনার আগে থেকেই গেনেসটারের রাগ ছিলো তোমার প্রতি?'

'কেন ? আমাদের তো আগে দেখা হয়নি কখনো ?'

'ঠিক। সেও তোমাকে দেখেনি, তোমার পরিচয়ও জানতো না। সে-ক্ষেত্রে অ্যাদ্দিনে ওর রাগ পড়ে যাওয়া উচিত ছিলো, তাই না ?'

'আমার যে মগজে কিছুই ঢুকছে না, ক্যাপটেন। একজন মানুষের যা যা থাকা উচিত—অর্থ, যশ, সম্মান—সব আছে ওর। আর আমার সেখানে একটা স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নেই।'

'এমনও তো হতে পারে যে তুমি তার লাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছ ?'

'তা কী করে সম্ভব, ক্যাপটেন। ওর তুলনায় তো আমি নস্যি।'

'হয়তো তোমার পরিচয় এখন জেনে ফেলেছে সে।'

'এতে জানার মতো কী আছে ? আমি গরীব চাষা, হাওড়ে কয়েক একর জমি আছে, ব্যাস। তাও আমার বাবার কল্যাণে পেয়েছি, তিনি ভালো যোদ্ধা ছিলেন তাই।'

'এবং তাঁকেই একটা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।'

'ওহ, এই কথা! সেই আর্ল বলেছিলেন জীবনে আমি যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি তার চেষ্টা তিনি করবেন '

'শুরুতে কথাটা অবশ্যি ওই রকমই ছিলো, কিন্তু তারপর চ্যানেলে অনেক জল গড়িয়েছে। সেই লোক—সময় হলে নিজের নাম প্রকাশ করবেন তিনি—আর্মাডা হামলায় এক ছেলেকে হারিয়েছেন। আরেকজন গেছে প্লেগে। এখন তিনি বৃদ্ধ, এক ভাতিজা ছাড়া তিন-কূলে কেউ নেই। ওই ভাতিজাই তার সব কিছু পাবে—অথচ ওকে তিনি দুচোখে দেখতে পারেন না।'

'ভাতিজাটা কে, গেনেস্টার ?'

'হ্যাঁ।' চোলাই শেষ করে টমাস হাতের পিঠ দিয়ে মুখ মুছলেন।

'একদিন রাতে পুরাতত্ত্ব নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আলাপ করছিলেন তিনি। একজন দুটো স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়ে ওগুলোর ইতিহাস শোনালেন।

'বহুকাল বাদে আবার সেই প্রিয় লোকটি, যে তাঁকে যুদ্ধের মাঠে বাঁচিয়েছিল, তার নাম শুনলেন বৃদ্ধ। সেই সাহসী সৎ লোকটির কথা স্মরণ করলেন তিনি, জানলেন তার এক ছেলে আছে। পূর্বপ্রতিশ্রুতি মনে পড়লো। গেনেসটারের সঙ্গে তোমার যে ঝামেলা চলছে, হ্যাস-লিং তাও বললেন।'

'আমি কিন্তু এখনো…'

হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিলেন টমাস। 'সবুর করো। হ্যাস-লিংয়ের কাহিনী সারা হলে গ্লোবের ঘটনা এবং তোমার সাথে আমার পরিচয়পর্বের কথা বললাম আমি।

'সব শুনে বৃদ্ধ বললেন তাঁর ভাগ্য তাকে একটা স্থির সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করছে। তোমার পালানোর ঘটনাটা তিনি পুরোপুরি উপভোগ করেছেন। এতে তোমার উপস্থিতবুদ্ধির পরিচয় মেলে। প্রথম সাক্ষাতে তুমি গেনেসটারের কী দশা করেছিলে শুনে হাসি চাপতে পারেননি তিনি।'

'করনিভোর অবদানটা ভুলবেন না, ক্যাপটেন। ওর সাহায্য ছাড়া…'

'সবার বন্ধুভাগ্য এমন হয় না। এটাও তোমার যোগ্যতার স্বাক্ষর। না না, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না, বাবা। এখন তোমার সাথে উনি দেখা করতে চান।'

'বেশ তো…'

'কিন্তু সেখানেই হয়েছে যত গোল। গেনেসটার কীভাবে যেন, সম্ভবত কোনো চাকরের কাছ থেকে, জেনে ফেলেছে সেটা। ওর সব

আশাভরসা ওই বৃদ্ধকে ঘিরে। নিজের বলতে বজ্জাতটার কিছুই নেই। এখন তিনি যদি সম্পত্তি তোমাকে···'

'এ হয় না, ক্যাপটেন।'

'এতে না হবার মতো কিছু নেই, অ্যালান। বরং একটা সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে। তোমার বাবাকে স্নেহ করতেন উনি, এবং তুমিও যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছো। ভদ্রলোক এর কদর বোঝেন। তাই আমার পরামর্শ, আমেরিকা যাবার আগে ওঁর সাথে একবার কথা বলো তুমি।'

'তা না হয় বলবো। কিন্তু এই বলে রাখছি, আমি নিজের পথেই চলবো, ক্যাপটেন।'

'ঠিক আছে। তবু ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করো অন্তত। শিগগিরই আমি যাবো ওখানে। মাঝের এই সময়টুকু সাবধানে থেকো।'

বড়লোকদের বড় বড় খেয়াল, তবে আমার ওতে আদৌ আস্থা নেই। নিজের প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছুতে বিশ্বাস করি না আমি। সোনার খোঁজ পাওয়াটা ভাগ্যের ব্যাপার সত্যি, কিন্তু অন্যদিকে, আমি সে-দিন কাজ সেরে ওই পথে বাড়িতে রওনা না হলে সোনা পেতাম না। সোনা আমার কাছে আসেনি, আমিই তার কাছে গিয়েছি।

'দিন তিনেকের জন্যে একটু বাইরে যাচ্ছি,' জানালাম আমি।

উনি তাকাতে বললাম, 'প্রাচীন জিনিসের খোঁজ পেয়েছি এক জায়গায়। দেখ, যদি কিছু মেলে।'

'উইশ ইউ গুড লাক, দেন। ফিরে দেখা করো।'

ক্যাপটেন বিদায় নিলে জুবলেন আর করনিভোর সাথে দেখা করলাম। 'একটা ঘোড়া দরকার,' বললাম।

'এ আর এমন কী কঠিন,' বললো করনিভো। 'কিন্তু মানুষ তো আমরা তিনজন?'

'যে-কাজে যাচ্ছি, শূন্য হাতে ফিরতে হতে পারে।'

কাঁধ ঝাঁকালো জুবলেন। 'আমাদের কারোরই কোনো কাজে এ-পর্যন্ত লাভ হয়নি, তবে আমি লক্ষ্য করেছি তোমারটায় তবু খানিকটা বুদ্ধিমত্তার ছাপ থাকে।'

সংক্ষেপে ওদের জানালাম ব্যাপারটা। 'গুপ্তধন পাবার আশা করো না,' সাবধান করে দিলাম। 'নিতান্ত সাদামাঠা জিনিস হতে পারে—একটা রোমান তলোয়ার, কিংবা কোনো মৃৎশিল্প বা ওই জাতীয় কিছু। আবার এমনও হতে পারে যে পুরো খাটুনিটাই মাঠে মারা গেল।'

'তুমি একা গেলে,' বললো জুবলেন, 'বিপদে পড়বে। সুতরাং আমরাও যাচ্ছি।'

শুধু খাবার এবং গাঁইতি আর শাবল নিলাম সাথে। শেষের দুটো একটা কম্বলে পেঁচিয়ে নিয়ে ঝটপট বেরিয়ে পড়লাম আমরা। শহর এবং কয়েকটা গ্রাম ছাড়িয়ে জঙ্গলে ঢুকলাম।

'ফেউ লেগেছে, অ্যালান,' সহসা বললো জুবলেন।

পেছনে তাকিয়ে একটা পাহাড়ের মাথায় একজন নিঃসঙ্গ ঘোড়-সওয়ারকে চোখে পড়লো। হাবভাবে মনে হলো প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করছে। 'ও কিছু না, বেড়াতে বেরিয়েছে সম্ভবত।'

'তাই আমরা মোড় নিলে, সেও মোড় নিচ্ছে। থামলে সেও থামছে?'

'ঠিক আছে, তৈরি থাকো তাহলে।'

আমাদের ঘোড়াগুলো ভালো, কিন্তু ওদের ছোটার ক্ষমতা পরীক্ষা

করতে মন সায় দিলো না আমার। এই অঞ্চলে আগেও এসেছি। সামনে একটা গোলাবাড়ি আর পাঁচিল-ঘেরা মাঠের মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে নিচু হয়ে গেছে রাস্তাটা। তারপর পুরো এলাকাটা জলমগ্ন, সেখান থেকে এই রাস্তার তিনটে শাখা বেরিয়ে গেছে। দুটোর মাঝখানে পড়েছে একটা ছোট নদী।

দ্রুত মাঝের রাস্তাটা ধরে নদীতীরে চলে এলাম আমরা। পানি ভেঙে অন্য রাস্তায় উঠে জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম।

ঈপ্সিত জায়গাটা চিনতে পারবো তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিলো না, তবু খুঁজে পেতে যথেষ্ট সময় লাগলো। ঘোড়া থেকে নেমে আশপাশে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে তাকাতে লাগলাম। করনিভোই সবার আগে দেখতে পেলো ওটা।

'ওই যে!' বললো সে। 'টিলার কাছে!'

সেই রাতে যে-গর্তে পড়ে গিয়েছিলাম আমি তার চারপাশ ঘুরে দেখলো করনিভো। 'এই যে এখানে মেঝের কোনা বেরিয়ে আছে একটা। এসো, চেষ্টা করে দেখি।'

নীরবে মাটি কোপাতে লাগলাম আমরা। ভাঙা টালি, একটা রোবের ছেঁড়া টুকরো, ভাঙাচোরা বাসন ইত্যাদি মিললো। আরো কিছুদূর খোঁড়ার পর একটা ধসে-পড়া দেয়ালের নিচে কালো পরিষ্কার মাটি বেরিয়ে পড়লো।

মন্থর গতিতে কাজ করছে ওরা, খুব সাবধানে প্রতিটা মাটির চাকা ভেঙে দেখছে কিছু মেলে কি না। অবশেষে এক সময় সোজা হয়ে দাঁড়ালো জুবলেন। 'অ্যালান,' ডাকলো সে, 'দেখে যাও, মেঝের নিচে কী পেয়েছি।'

'সেলার কিংবা টানেল হবে হয়তো,' জবাব দিলাম।

মাথা নাড়লো করনিভো। 'উঁহু'। মেঝেটা অনেক পরের তৈরি। এটা আরো প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ। রোমানদেরও আগের।'

'রোমানদের আগে এ-দেশে কে এসেছিল?' প্রশ্ন করলো জুবলেন।

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'আর্থার···নাম শুনেছো? আর্থার এসেছিলেন। সম্ভবত কেল্ট ছিলেন উনি। ডেনরা অবশ্যি এসেই চলে যায়। আসলে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যাচ্ছে না।'

সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে লাগলাম আমরা। এখন যেখানে কাজ করছি সেখান থেকে পাঁচ ফুট ওপরে মেঝেটার দিকে তাকালাম আমি। 'নিছক খেয়ালের বশেও কেউ বানিয়ে থাকতে পারে,' বিরক্তির সুরে বললাম।

জুবলেন তার শাবলে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। 'আর এগোনো উচিত হবে না আমাদের,' দৃঢ় সুরে বললো। 'এই জায়গা সম্পর্কে কিছুই জানি না আমরা। পুরাতাত্ত্বিক সংঘ দেখলে হয়তো বলতে পারবে।'

'ওরাও খুব বেশি জানে বলে মনে হয় না,' আমি বললাম। 'জুবলেন, তুমি ওপরের মেঝেটা খোঁড়ো। করনিভোকে নিয়ে আমি এদিকটা দেখছি। আমরা যথাসম্ভব সাবধানে কাজ করবো যাতে কোনো কিছু নষ্ট না হয়।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়লো। তাই তো, সেই ঘোড়সওয়ারের কী হলো?

'অস্ত্রপাতি হাতের কাছে রাখো,' চাপা স্বরে বললাম। 'গতিক সুবিধের ঠেকছে না আমার।'

'আমার মনও কু গাইছে,' ভয়চকিত গলায় বললো জুবলেন। 'বহু লোক মারা গেছে এখানে। দেখো,'—কয়েকটা প্রাচীন পোড়া কাঠ দেখালো সে—'খুব সম্ভব চিতা জ্বালানো হয়েছিল।'

সাবধানে খুঁড়ে চললো করনিভো, আমিও হাত লাগালাম। মাটিটা বেশ ভালো…মৃতের অস্থিমজ্জায় উর্বরা, ভাবলাম। কারা বাস করতো এখানে? নিজেদের নিয়েই কি বিভোর ছিলো তারা? অতীতের প্রতি ঈষৎ ঘৃণামিশ্রিত আগ্রহ কি তাদেরও ছিলো?

একটা গোলাকার মসৃণ জিনিস চোখে পড়লো 'নরমুণ্ড,' মাটি থেকে কুড়িয়ে নিতে নিতে বললাম আমি। 'তলোয়ারের আঘাতে কাটা পড়েছে।'

একটু বাদে অবশিষ্ট হাড়গোড়েরও সন্ধান পেলাম। তারপর গাঁইতির ফলায় বেধে একটা থলে উঠে এলো। থলেটা মোহরে বোঝাই; বেশির ভাগই সোনার। তোলার সময় আপসে বেরিয়ে পড়লো দুটো।

একটাতে রথ আঁকা। ঘোড়াটা পেছনে তাকিয়ে আছে, লেজ তোলা। যুদ্ধের বেশে দেখা যাচ্ছে একজনকে, তবে সেটা পুরুষ না মহিলা আমরা কেউই বলতে পারলাম না। অপরটায় একজন উপবিষ্ট মহিলার ছবি, হাতে দণ্ড। তাতে কিছু প্রতীক বা অক্ষর খোদাই করা।

'পেয়েছি!' ওগুলো দেখিয়ে বললো জুবলেন। 'যে-জন্যে আসা তা পেয়েছি। চলো, এবারে কেটে পড়ি।'

'চলো,' আমি বললাম।

মুদ্রাগুলো আমি নিজের কাছে রাখলাম। ওপরে উঠে গায়ের ধুলোবালি ঝেড়ে ফেললাম সবাই। তারপর পা দিয়ে মাটি ফেলে গর্তটা বুজিয়ে দিলাম আমি।

'চলো, রওনা দেই,' বললাম। 'রাত নামার আগে কিছুটা অন্তত এগিয়ে থাকতে পারবো।'

বনের ভেতর দিয়ে এক সাথে হাঁটা দিলাম সবাই। ইতিমধ্যে

ঝোপঝাড়ে থোকা থোকা অন্ধকার জমতে শুরু করেছে। আমাদের কারো মুখে কথা নেই, প্রত্যেকেই যে যার চিন্তায় ডুবে আছে। যেখানে ঘোড়া রেখে গিয়েছিলাম সেখানে পৌঁছে দেখলাম আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা। আটজন, প্রত্যেকেই সশস্ত্র। বর্তমানে আমার মনের যা অবস্থা তাতে একাই সামলাতে পারবো ওই কজনকে।

হাতের শাবলটা ওদের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে তলোয়ার নিয়ে তেড়ে গেলাম আমি। আচমকা গায়ের ওপর শাবল এসে পড়ায় ওরা থতমত খেয়ে গেল, আমার তলোয়ারের আঘাতে একজনের গাল দুফাঁক হয়ে গেল, তার পাশের জনের ভ্রূতে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হলো একটা। দুজনের গা থেকেই দরদর করে রক্ত ঝরতে লাগলো। হঠাৎ চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করলাম একটা তলোয়ার নেমে আসছে আমার মাথা বরাবর। বিদ্যুৎবেগে বাউলি কেটে সরে গেলাম আমি, পা বাড়িয়ে ল্যাং মারলাম, লোকটা চিত হয়ে পড়ে গেল। আমার তলোয়ার আমুল বিঁধে গেল ওর বুকে।

জুবলেন চমৎকার ভেলকি দেখালো। সম্মুখযুদ্ধে ওর প্রচুর অভিজ্ঞতা। মাথা নিচু করে সবেগে ছুটে গেল সে। শাবলের আঘাত থেকে মাথা বাঁচাতে শূন্যে দুহাত তুলে দিয়েছিল একজন, জুবলেন তার বুকের ডান দিকে তলোয়ার ঢুকিয়ে বাঁয়ে মোচড় দিলো একটা।

বেগতিক বুঝে আচমকা রণে ভঙ্গ দিলো ওরা। করনিভো একমুঠো ধুলো ছুঁড়ে দিলো ওদের চোখে, শাবলের বাড়ি দিয়ে ধরাশায়ী করলো দুজনকে।

'যাহ্, পালিয়ে গেল।' চারপাশে তাকালাম আমি। দুটো খতম হয়েছে, একজন অস্ফুট স্বরে গোঙাচ্ছে, আরেকটা অচেতন হয়ে পড়ে

আছে।

'ভাড়াটে গুণ্ডা, সাহস নেই!' ঘৃণার স্বরে বললো জুবলেন।

আমরাও কমিবেশি আহত হয়েছি। বাহুতে চোট লেগেছে আমার, মুগুরের আঘাতে করনিভোর কাঁধ ফুলে ঢোল হয়ে গেছে।

ঘোড়ায় চাপলাম আমরা, শত্রুর ফেলে-যাওয়া দুটো তলোয়ার আর একটা ছোরা আমাদের বাড়তি লাভ হয়েছে।

'ট্যাবার্ড ছাড়তে হবে,' ফেরার পথে বললাম।

'কোথায় যাবে তাহলে?' শুধালো জুবলেন।

'একখানে যাওয়া যায়,' বললো করনিভো। 'এক নাবিকের বাসায়। ও বাইরে থাকায় বাড়িটা বলতে গেলে খালিই পড়ে আছে। ওর বউ ছাড়া কেউ নেই। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আমি থেকেছি ওখানে।'

'আর নয়তো জাহাজে গিয়ে উঠতে হয়,' আমি বললাম।

ট্যাবার্ডে আমাদের মালপত্র ছিলো, সেগুলো নেয়ার জন্যে ফিরতে হ্যাসলিংয়ের সাথে দেখা হয়ে গেল পানশালায়।

'এসেছো তাহলে!' আমাকে শুভেচ্ছা জানালেন তিনি।

'কিছু জিনিস রয়ে গেছে।'

গ্লাসে চোলাই নিয়ে দোতলায় আমাদের ঘরে গেলাম। থলে বের করে মুদ্রাগুলো দেখালাম তাঁকে। বুঝিয়ে বললাম কোথায় পেয়েছি ওগুলো।

'চমৎকার!' মোহরগুলো একে একে পরীক্ষা করার সময় দুআঙুলে নাকের পাটা চুলকাতে লাগলেন তিনি। 'সত্যিই দারুণ। ভালো দাম পাবে।'

'আপনি নিয়ে যান,' আমি বললাম। 'টাকা হাতে এলে ক্যাপটেন টমাসের কাছে আমার কথা বলে দিলেই চলবে।'

হ্যাসলিংয়ের দিকে থলেটা ঠেলে দিয়ে জুবলেনকে বললাম, 'তুমি আর করনিভো জিনিস নিয়ে টমাসের জাহাজে চলে যাও। ওটার নাম টাইগার। দুশো টনি ত্রিমাস্তুল জাহাজ। কোনো ফোরক্যাসল নেই। আমার জন্তে অপেক্ষা করবে ওখানে। আমি সেনট পলস ওঅক হয়ে আসছি।'

'সাবধানে থেকো,' বললো জুবলেন। 'যে-কোনো সময় একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। জায়গাটা বিশেষ ভালো নয়।'

'গেনেসটার আসল খবরটা এখনো পেয়েছে বলে মনে হয় না ওরা এত তাড়াতাড়ি পৌছুনোর কথা নয়। আমি ফেরার পথে আমাদের বাদবাকি মাল নিয়ে যাবো।'

'আমাদের মানে?' হতভম্ব হয়ে গেল জুবলেন। 'ওগুলো তো তোমার একার।'

'আমাদের,' বললাম আমি। 'অর্ধেক আমার, এবং সিকিভাগ করে তোমাদের দুজনের। আর যদি তোমরা কেউ যেতে না চাও, মাল রেখে যাবে।'

করনিভো হাসলো। 'জীবনে এমন বন্ধু কখনো পাইনি। আমি থাকছি, মাস্টার ওসমান।'

'আমিও,' বললো জুবলেন। 'একদিন না একদিন মরতে যখন হবেই, বন্ধুদের সাথে মরাই ভালো।'

সেনট পলস গির্জায় লোক গিজগিজ করলেও পিটার টালিসের আস্তানা খুঁজে পেতে অসুবিধে হলো না। আমাকে দেখে হাসলো সে। একটা প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'নাও, সব আছে এতে।'

দ্রুত কয়েকটা পাতা উলটে দেখে নিলাম পাণ্ডুলিপিটা ঠিক আছে, এটাই চাইছিলাম আমি। দাম শোধ করে দিলাম

টাকা নিয়ে হাসলো টালিস। 'আবার কিছু দরকার হলে' বললো সে, 'এসো। তোমার কাজের ধরন আমার পছন্দ হয়েছে।'

'আছে।' একটা বেনচিতে বসলাম আমি। বোধ হয় আরো কিছু সাহায্য করতে পারবে তুমি।'

ইশারায় একগাদা পাণ্ডুলিপি দেখালো সে। 'ভারি বিরক্তিকর কাজ। কিন্তু তোমারটায় আনন্দ পেয়েছি। পড়েছি সবটা। এখন আমি ইংল্যানড সম্পর্কে অনেকের চেয়ে বেশি জানি।'

'আমেরিকায় যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্যে আসে এ-রকম কিছু চার্টের কথা শুনেছি,' শুরু করলাম আমি 'এমনকি অ্যাডমিরালরাও এগুলোর কথা জানেন না।'

'চার্ট?' চোখের পাতা পিটপিট করলো টালিস। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এটাও বেশ মজার কাজ হবে। মিঃ রিচার্ড হ্যাকলিড প্রায়ই আসেন আমার কাছে, তবে বইয়ের ব্যাপারেই ওঁর আগ্রহ বেশি। আমি বরং দোকানটা বন্ধ করে দেই। কাছেই একটা পানশালা আছে, ওখানে বসে আলাপ করবো, কেমন?'

ঘাড় কাত করে সায় দিলাম আমি।

পিটার টালিস ভীষণ চালু লোক, অনেক বিষয় জ্ঞান রাখে। চোলাই খেতে খেতে বহু কথা হলো আমাদের। এক পর্যায় উপযুক্ত দামের বিনিময়ে বারোটা চার্ট হস্তান্তর করলো সে।

চার্টগুলো নিয়ে ট্যাবার্ডে ফিরে গেলাম আমি। শান্ত পরিবেশ। কেবল একটা ভাগড়া লোক ঠেলাগাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটো ভেজা ভেজা। লোকটাকে আমার মোটেও পছন্দ হলো না।

ওই ঠেলাটা ভাড়া করলাম। ওর সাহায্যে বাকি মালপত্র নামিয়ে

এনে তুললাম গাড়িতে। একটা ব্যাগে চার্টগুলো ভরে ওটাও তুলে দিলাম।

'টাইগার জাহাজে যাবো। চেনো?' জিজ্ঞেস করলাম।

'টমাসের জাহাজ তো? হ্যাঁ, চিনি।'

গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। মোটা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঠেলার পেছন পেছন হাঁটতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পর টাইগারের কাঠামো চোখে পড়লো, পাশে গ্যারি লিনেকারের জলি জ্যাক। অবসাদে ভেঙে আসছে আমার শরীর, ঘুমে চোখ ঢুলুঢুলু। কতক্ষণে জাহাজের উষ্ণ বিছানায় আশ্রয় নেবো তাই ভাবছি কেবল। জলি জ্যাকের দিকে তাকালাম এক ঝলক। অন্ধকার, কোনো প্রাণের চিহ্ন আছে বলে মনে হলো না।

হঠাৎ আমার পেছনে কয়েক জোড়া পদশব্দ শুনতে পেয়ে চকিতে ঘুরে গেলাম, হাত চলে গেল তলোয়ারের বাঁটে, কিন্তু ভারি কম্বল-খানা বাধা হয়ে দাঁড়ালো। ঠিক এই সময় ঠেলাটা পিছিয়ে এসে ধাক্কা দিলো, ভারসাম্য হারিয়ে ফেললাম আমি।

আমাকে ঘিরে ধরলো ওরা। মরিয়া হয়ে সোজা হতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ততক্ষণে আমার হাতদুটো শক্ত মুঠোয় আটকা পড়ছে। প্রাণপণে চিৎকার করতে চাইলাম, কম্বল দিয়ে মুখ চাপা দিলো একজন। মাথার পেছনে বাড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে। বুঝলাম চেষ্টা বৃথা, এরপর ওরা হয়তো মেরেই ফেলবে আমাকে, এখন তবু তো বাঁচার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে।

'ওয়েল ডান।' বললো কেউ। ঝনঝন শব্দ থেকে অনুমান করলাম টাকার থলে হাতবদল হলো। 'শোনো, লিনেকার,' আবার ভেসে এলো গলাটা, 'এই হারামিটাকে আর দেখতে চাই না আমি।'

'চিন্তা করো না। অচিরেই হাঙরের খিদে মেটাবে ও।'

সাত

পাঁজাকোলা করে জাহাজে তোলা হলো আমাকে, হ্যাচ খুলে ছুঁড়ে দিলো হোলডে। তারপর মালপত্র নামিয়ে দিয়ে বন্ধ করে দিলো ঢাকনা।

হ্যাচ বন্ধ হয়ে গেলে উঠে বসতে চেষ্টা করলাম, বোঁ করে ঘুরে উঠলো মাথা, ব্যথায় টনটন করছে খুলি। বহুকষ্টে গা থেকে খসিয়ে ফেললাম কম্বলটা। চিত হয়ে শুয়ে বন্ধ গরম বাতাসে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে লাগলাম। যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে জোরে আঘাত করা হয়েছে আমাকে, ঝিমঝিম করছে মাথা। একটু বাদে আমার চেতনা প্রায় পুরোপুরি লোপ পেলো, অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর কোনো বোধ-শক্তি রইলো না।

সহসা একটা কিছুর নড়াচড়ায় আমার সাড়া ফিরে এলো আবার, জল কেটে ছুটছে জাহাজটা। নিশ্চয়ই রাতে নদী পেরিয়ে এসেছি, ঢেউয়ের দোলা এখানে নদীর চেয়ে বেশি মনে হচ্ছে। মাতালের মতো উঠে বসলাম আমি, পিপাসায় কাশি এসে গেল।

হোলডের ভেতরটা নিশ্ছিদ্র আঁধার, দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই হ্যাচে মাথা ঠুকে গেল।

ডেক থেকে একটা পদশব্দ ভেসে এলো, চেঁচিয়ে কেউ কাউকে

বললো কিছু। পরক্ষণে বেড়ে গেল জাহাজের গতি। দুহাতের তালুতে মাথা রেখে বসলাম আমি তাহলে ওদের খপ্পরেই শেষ পর্যন্ত পড়তে হলো। রুপার্ট গেনেসটারের নির্দেশে গ্যারি লিনেকার বন্দী করেছে আমাকে।

তবে চিরকাল আটকে রাখবে না। ওদের শেষ-কথা শুনতে পেয়েছি আমি : 'অচিরেই হাঙরের খিদে মেটাবে ও।' আচ্ছা, সময় আসুক, দেখা যাবে কে হাঙরের পেটে যায়।

মাথা ঝাঁকালাম আমি, ব্যথায় সারা শরীর ছেয়ে গেল। যাই ঘটুক, প্রস্তুত থাকতে হবে। মরার ইচ্ছে নেই আমার, একটা শয়-তানকে কিছুতেই জিততে দেবো না আমি।

লিনেকার সম্বন্ধে একটা রটনা চালু আছে : কাজের লোকের কমতি হলে গাঁয়ের ছোকরাদের পটিয়ে-পাটিয়ে জাহাজে তোলে। মনে হয় না ও এত জলদি মেরে ফেলবে আমাকে—বিশেষ করে যখন খাটিয়ে নিতে পারবে। আমার গায়ে শক্তি আছে। গোলার লোকেরা বলতো দুজনের শক্তি ধরি। কিন্তু আমি জানি, তার চেয়েও বেশি।

আমাকে যাতে বাঁচিয়ে রাখে ওরা এবং কাজ দেয় তেমন একটা ছুতো যেভাবেই হোক বের করতে হবে। তবেই সুযোগের ফিকিরে থাকতে পারবো। লিনেকার বোকা নয়; সব ধরনের ভাঁওতাবাজি নিশ্চয়ই জানা আছে। সব চেয়ে ভালো উপায় ওদের সঙ্গে সেধে লাগতে না যাওয়া।

আবার ঘুমিয়ে পড়লাম, যখন চোখ খুললাম গভীর সমুদ্রে এসে পড়েছি। হ্যাচের ঢাকনা ঈষৎ ফাঁক করে একটা মুখ উঁকি দিলো। 'হয়েছে, উঠে এসো এবার। কাজ আছে।'

লাফ দিয়ে হ্যাচের প্রান্ত ধরলাম আমি, দোল খেয়ে উঠে পড়লাম

ডেকে।

পিছিয়ে গেল মেট। স্থূল দেহ, লাল চুল, ডান চোখের নিচে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। কুঁতকুঁতে নীল চোখদুটো থেকে শয়তানি ঝরে পড়ছে। গোলমাল আশঙ্কা করছে লোকটা, পেছনে দুজন তাগড়া জোয়ান দাঁড়িয়ে আছে।

'জাহাজ!' বললাম আমি। 'এর জন্যেই তো হা-পিত্যেশ করে বসে ছিলাম এতদিন, কবে জাহাজে চড়ে সাগর পাড়ি দেবো।'

ওরা হতভম্ব হয়ে গেল, কটমট করে তাকালো, অসন্তোষ প্রতিবাদ ঝামেলা এ-সব আশা করেছিল—অথচ উলটো ওদের দিকেই দাঁত বের করে হাসছি!

'আমাকে দেখিয়ে দাও না, ভাই, কীভাবে জাহাজি হতে হয়। জীবনে এটাই আমার একমাত্র আশা!'

'তাই দেবো!' মেট ব্যাটা বুঝে উঠতে পারছে না, রাগ করবে না খুশি হবে। 'আগে বাড়ো!'

বাধ্য ছাত্রের মতো হুকুম তামিল করলাম, ফোরসেইল তোলায় সাহায্য করলাম ওদের। হ্যাচ খোলা রইলো দেখে মনে মনে ভীত হয়ে উঠলাম আমি। এখন আমার জিনিসপত্র পরীক্ষা করে দেখলে উপায়? কিন্তু তা করলো না। খানিকবাদে ঢাকনাটা নামিয়ে দিলো আবার।

অমানুষিক পরিশ্রম করলাম আমি। ইতিপূর্বে আমার বংশের কেউ এত পরিশ্রম করেছে বলে শুনিনি। তবু বাকি মাল্লাদের সঙ্গে নিজের তুলনা করে স্পষ্ট অনুভব করলাম ওদের কাছ থেকে কোনো সাহায্যের প্রত্যাশা বৃথা, প্রায় সবাই এক-একটা অমানুষ।

এমন ভান করলাম যেন জাহাজের ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি,

কিন্তু আসলে তো তা নয়। হাওড়বাসীদের হরহামেশা সমুদ্রে যেতে হয়। ওরা যাতে বাঁচিয়ে রাখে আমাকে সে-জন্যে দুজনের সমান খাটতে লাগলাম।

তিনদিনের মাথায় ক্যাপটেন লিনেকারের সাথে মেটকে তর্ক জুড়তে শুনলাম। ওর নাম বেরিম্যান। 'এত তাড়ার কী আছে, ক্যাপটেন? ওই অ্যালান ছোঁড়া দুজনের সমান খাটতে পারে। মনে হয় পোষ মেনে গেছে। দিন-রাত ওই এক কথা মুখে, ওর আজীবন ইচ্ছে জাহাজি হবে। সত্যি। ছোঁড়া খাটতে পারে বটে, অসুরের মতো।'

সেই থেকে লিনেকার ডেকে এলেই চোখে চোখে রাখে আমায়। অনেকবার ও আর বেরিম্যান জেরা করেছে, একদিন বেরিম্যান জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি গাঁয়ের ছেলে?'

'হ্যাঁ, হাওড়ের। বলতে গেলে নৌকোই আমাদের একমাত্র বাহক ওখানে।'

এতে ওরা আপাতত সন্তুষ্ট হলো বটে, কিন্তু একদিন বেরিম্যান সরাসরি প্রশ্ন করলো এসে, 'তোমার মতো একজন গাঁইয়ার কেন শত্রু থাকবে?'

সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে দেরি করলাম না। আমাকে বাঁচিয়ে রাখার মতো যথেষ্ট কারণ ওদের হাতে তুলে দিতে চাইলাম। 'হ্যাঁ, অনেকে আমার মৃত্যু কামনা করে সত্যি,' ওর কথায় সায় দিয়ে বললাম, কিন্তু আবার এমন কিছু লোকও আছে যারা আমাকে জীবিত ফেরত পেলে দ্বিগুণ দাম দেবে।'

রুপার্ট গেনেসটারের কাছ থেকে লিনেকার তার পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়েছে কিন্তু ফাঁকতালে আরো কিছু হাতিয়ে নেবার মওকা পেলে সেটা সে নাও ছাড়তে পারে।

'বাজে কথা,' মিনিট দুয়েক পর বললো বেরিম্যান, 'কে তোমাকে ফেরত পেতে চাইবে ?'

'একটু মাথা খাটালেই বুঝবে,' আমি বললাম। 'আমাকে মেরে ফেলার জন্যে কেউ পয়সা খরচ করার অর্থ, এ থেকে সে লাভবান হবে। আমার মৃত্যুতে তার যদি লাভ হয় তো অন্যদের লোকসান হবে। সেই অন্যেরাই চাইবে যে আমি বেঁচে থাকি

'যে-লোকটা আমাকে মেরে ফেলতে চায় তার বেশি টাকা-কড়ি নেই। সত্যি বলতে কি, আমি যদি জীবিত অবস্থায় ফিরে যাই, পথের ফকির হয়ে যাবে সে .'

পরবর্তী দুহপ্তা ভালোয় ভালোয় কাটলো। প্রচুর পরিশ্রম করলাম আমি ওরা পারতপক্ষে এড়িয়ে চললো আমাকে, কোনো বিপজ্জনক কাজ চাপালো না ঘাড়ে। কিন্তু তাই বলে ওদের কাউকে একরত্তি বিশ্বাস করলাম না। সব খুনে ডাকাত। বুঝতে পারছি আমার সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। শিগগিরই ওরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে আমাকে খুন করবে কি না। আমি ইংল্যানডে একবার ফিরতে পারলে ওদের কপালে কি ঘটবে তা ওরা ভালো করেই জানে।

কদিন বেশ চমৎকার আবহাওয়া কাটলো। দিগন্তে কোনো পাল যদি দেখা যায় এই ভরসায় চোখ সব সময় খোলা রাখছি, প্রতি মুহূর্তে ক্যাপটেন টমাসকে এখানে আশা করছি। তবে উনি জলি জ্যাকের সাথে লড়বেন কি না সন্দেহ আছে আমার। এই জাহাজে কামান বারোটা। টাইগারের ডেকে যেগুলো দেখেছি তার চেয়ে এগুলো শক্তিশালী। তাছাড়া জ্যাকের মাল্লারা সবাই দস্যু।

তারপর খারাপ আবহাওয়ার মুখোমুখি হলাম। বাতাস উলটো দিকে বইতে শুরু করলো, দিন কে দিন অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে।

সবার মেজাজ খিঁচড়ে উঠছে, যথাসম্ভব বেরিম্যান কিংবা লিনেকারের নজর এড়িয়ে চলছি। জানি, আমিই হবো ওদের রাগের একমাত্র শিকার। এর মধ্যে একদিন একটা জাহাজ চোখে পড়েছে আমাদের তারপর ঝড়ের পঞ্চম দিনে আরেকটা। কিন্তু ওটা বেশ দুরে ছিলো, এবং বাতাসের মাতামাতির কারণে আমাদের যাওয়াও সম্ভব ছিলো না সেখানে।

জাহাজের একজনকে কিছুটা মনে ধরেছে আমার—তরুণ স্বাস্থ্যবান, তবে লম্বা নয়, গায়ের রং শ্যামলা কিন্তু নিগ্রো নয়। লোকটা নিজেকে একজন মুর বলে পরিচয় দিয়েছে আমার কাছে। মুর কাদের বলে আমি জানি না। ও বলেছে আরব বংশোদ্ভুত আফ্রিকানদের মুর বলা হয়। উত্তর আফ্রিকায় এদের বাস। সেখানে কালোদের সংখ্যা অতি-নগণ্য, অল্প কিছু দাস আছে কেবল…এবং তারা সংখ্যায় শেতাঙ্গ দাসদের সমান। লোকটার নাম সাকিম।

ও বেশ ঝানু মাল্লা। দু-একবার চোখাচোখি হয়েছে আমাদের, তবে ও কোনো কথা বলেনি। অবশেষে, পঞ্চম দিনে দুরের জাহাজটা চোখে পড়তে সাকিম চাপা স্বরে বললো, 'ওটা যে জাহাজই হোক, পারলে আমি চলে যেতাম।'

'আমিও,' অকপটে জাবাব দিলাম।

একটু বাদে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাদের সমমনা আরো কেউ আছে নাকি?

'আছে, একজন,' বললো সে। 'রুফিসকো। ওই নিয়াপলিটান লোকটা।'

ওকেও দেখেছি আমি, ছোটখাটো প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর মানুষ। ওকে দেখলে আমার করনিভোর কথা মনে পড়ে। দুজনের আচার-

আচরণে অদ্ভুত মিল রয়েছে।

'একটা উপায় আছে,' আমি বললাম, 'অবশ্যি তুমি যদি রাজি থাকো তাতে।'

'এই সমুদ্রে?' বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো সাকিম।

'তীরের কাছাকাছি,' বললাম আমি। মেইনল্যানডের এ-পাশে একটা উপকূল রয়েছে।'

'ওখানে তো জংলীদের বাস,' দ্বিধাগ্রস্ত সুরে বললো সে।

'এই নরকের চেয়ে অজানা জগৎ ঢের ভালো। এরা আমাকে ফিরতে দেবে না। সুতরাং আমার কিছু হারাবার ভয় নেই। তোমার?'

'আমারও না,' ও বললো। 'ঠিক আছে, রুফিসকোর সাথে কথা বলবো আমি।'

এরপর আমরা আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, বাতাসের বেগ বেড়ে যাওয়ায় পাল নামিয়ে ফেলা হলো। বিরাট বিরাট রাক্ষুসীর মতো ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগলো ডেকের ওপর। কখনো-বা পাহাড়সমান ঢেউয়ের মাথায় উঠে গেল জাহাজ। তবে জলি জ্যাকের সুপারস্ট্রাকচার বেশ মজবুত, আরোহীদের ক্ষতি হলো না কোনো।

সাকিমের সাথে আমার আলাপের পর কয়েকদিন কেটে গেছে, ওর তরফ থেকে আর কোনো সাড়া পাইনি, মনে হচ্ছে কথা বলার মতো ফুরসত এখনো করে উঠতে পারেনি।

অবশেষে, আমাদের পালে অনুকূল হাওয়া লাগলো, দক্ষিণপশ্চিম মুখে ঘুরে গেল জাহাজ। মাঝে-মধ্যে মুষলধারে বৃষ্টি হলেও বাতাস থাকায় অসুবিধেয় পড়তে হলো না। সাতষট্টি দিনের মাথায় আবার ডাঙার সন্ধান পেলাম আমরা। দূর দিগন্তে আবছা দেখা গেল তীর, কিন্তু লিনেকার ঈষৎ দক্ষিণে সরে গিয়ে পাশ কাটিয়ে গেল।

রাতের পালায় ডিউটি ছিলো আমার। এক ফাঁকে মুর দেখা করলো আমার সাথে। 'রুফিসকো রাজি।'

'তাহলে প্রথমবারেই কাজ হাসিল করতে হবে। পরে আর সুযোগ নাও মিলতে পারে।'

'ওরা নির্ঘাত খুন করবে আমাদের,' বললো সে।

'শোনো, দোস্ত,' শান্ত অথচ দৃঢ় সুরে বললাম, 'এই শয়তানটার সাথে আমার একটা বোঝাপড়া বাকি আছে, পালাবার সময় কেবল আমার নিজের জিনিসই নেবো না, যতটা পারি ক্ষতিও করে যাবো ওর।'

'আত্মবিশ্বাসী লোককে পছন্দ করি আমি,' নিরুত্তাপ গলায় বললো সাকিম। 'বিশেষত সে যদি জীবিত থাকে।'

'আমি থাকবো,' বললাম। 'অন্তত ডাঙায় এক পা রাখার জন্যে হলেও।'

বেরিম্যান আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো। 'এত কীসের গুজগুজ!' খ্যাক করে উঠলো সে। 'যাও যাও, কাজ করো। ফালতু সময় নষ্ট করো না।'

'যাই,' অনুগতের মতো বললাম আমি।

নৈশপালা শেষ হলে নিচে গেলাম। অন্যদের নাকডাকা শুরু না হওয়া অবধি মটকা মেরে পড়ে রইলাম বিছানায়, তারপর চুপিসারে বাংক থেকে নেমে সেইল লকারে গেলাম। পালের গাদার ওপর হামাগুড়ি দিয়ে একটু চেষ্টা করতেই যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেলাম—একটা চোরাপথ, হোলডে ঢোকা যায় এখান দিয়ে।

সন্দেহ নেই চুরি করার মতলবেই কোনো মাল্লা এই কাণ্ডটি করেছে, তবে নিজের পাওনা ছাড়া অন্য কিছু নেবার ইচ্ছে আমার নেই।

সাবধানে চোরাপথে ঢুকলাম হোলডে। যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশি সময় লাগলো মালগুলো খুঁজে পেতে। কিছু খোয়া গেছে কি না দেখে নিলাম।

দুটো পিস্তল, এক-একটার জন্যে বারো রাউনড করে গুলি আর গানপাউডার। কাটল্যাস ছিলো চারটে, তিনটে পেলাম। একটা ছট্‌রা বন্দুক। হোলড থেকে বেরিয়ে বন্দুকটায় গুলি ভরলাম আগে।

একটা পিস্তল হাতে রেখে অন্যটা কোমরের বেলটে গুঁজে রাখলাম। আমার তলোয়ারটা ক্যাপটেন কেড়ে নিয়েছে, ওটার ব্যবস্থা পরে হবে, আপাতত এই কাটল্যাসগুলো অস্ত্র হিসেবে চমৎকার কাজ দেবে।

অন্ধকার ভেজা ডেকে আমার নিঃশব্দ যাওয়া-আসা কারো চোখে পড়েনি। সাকিম আর রুফিসকোকে জাগিয়ে ওদের হাতে একটা করে কাটল্যাস দিলাম।

'এসো।' ফিসফিস করে বললাম আমি। 'আজ রাতে একটা বোট দখল করবো আমরা।'

ডেকে বেরিয়ে এসে সুইভেল-গানটা দেখিয়ে সাকিমকে বললাম, 'ওখানে যাও। আমার নির্দেশ পেলে পছন্দসই টার্গেট বেছে নেবে।'

হুইলের দায়িত্বে রয়েছে ডার্কলিং, লোকটাকে আমি একদম পছন্দ করি না। ওর দিকে এগোতেই আমাকে দেখতে পেলো সে। 'ডেকে এসেছো কেন?'

'বোট নিতে,' শান্ত গলায় বললাম। 'তোমার হুইল চার ডিগ্রিতে সেট করো।'

'করবো না।'

ছট্‌রা বন্দুকটা ওর পেটের দিকে তাক করে বললাম, 'তাহলে মরো।

তোমার লাশের ওপর দাঁড়িয়ে অন্য কেউ কাজটা করে দেবে।'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার পানে তাকালো সে, তারপর হুইলটা ঘুরিয়ে দিলো। পালে হাওয়া পেয়ে উপকূলের দিকে সরে গেল জাহাজ। জানতাম এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, ঘটলোও তাই। বেরিম্যান উঠে এলো ডেকে।

'ব্যাপার কী?'

'হ্যাচের ওপর শুয়ে পড়ো,' আমি বললাম।

আমার বন্দুক আর পিস্তলদুটোর দিকে তার চোখ গেল; বেরিম্যান বুদ্ধিমান লোক, নীরবে হুকুম তামিল করলো।

'হুইলের ভার তোমার,' রুফিসকোকে বললাম। 'জাহাজ কূলে নিয়ে যাবে। ডার্কলিং, তুমি শুয়ে পড়ো বেরিম্যানের পাশে। বদ-মতলব করো না, গুলি খাবে।'

সুমসাম পরিবেশ। বেশি জোরে ছুটছি না আমরা, একটু বাদে কালো ফিতের মতো উপকূলরেখা চোখে পড়লো। আমার চার্টে এ-রকম একটা জায়গার উল্লেখ আছে, দক্ষিণে ছোট ছোট দ্বীপ রয়েছে কয়েকটা। কপাল ভালো হলে, এবং অনুমানে ভুল না হয়ে থাকলে ওই দ্বীপগুলো চোখে পড়তে দেরি নেই।

'তুমি একটা গর্দভ,' ডেক থেকে গর্জে উঠলো বেরিম্যান। 'এ-জন্যে তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে।'

'আমি যখন সত্যি কথাটা ফাঁস করবো,' মোলায়েম সুরে বললাম, 'তোমরাই ফাঁসিতে ঝুলবে।'

তীর ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছে। ভেজা মাটির গন্ধ পাচ্ছি, পাড়ে ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ ভেসে আসছে। কোনাকুনিভাবে এগিয়ে যাচ্ছি, তবে জাহাজ চড়ায় আটকে দেয়ার ইচ্ছে আমার নেই। সবাইকে

বিপদে ফেলতে চাই না আমি। ওরা সবাই এক-একটা ইতর, বিষাক্ত জীব ; পানিতে ফেলে দিলে ওই বিষক্রিয়ায় একমাইল দূরের মাছও মারা যাবে তাতে ভুল নেই—তবু এতগুলো আদমসন্তানকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে বাধো বাধো ঠেকলো।

জাহাজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্যে মন্থর গতিতে এগোচ্ছি। আমি পেছনে গিয়ে অ্যাসটার্নে-বাঁধা ডিঙিটা সামনে টেনে আনলাম। আমার গলা শুকিয়ে গেছে, ভয় ভয় করছে, অথচ বিকল্প রাস্তাও দেখতে পাচ্ছি না কোনো। ডার্কলিং ওঠার পাঁয়তারা করছে দেখে ওর দিকে বন্দুক তাক করলাম। লক্ষ্মী ছেলের মতো আবার শুয়ে পড়লো সে।

'গ্যারি আসলে,' ও হুমকি দিলো, 'মজা টের পাবে।'

'সাকিম,' বললাম আমি, 'হ্যাচের ঢাকনাটা খোলো।'

আমার মতলবের কিছুই জানে না বেরিম্যান আর ডার্কলিং, নিশ্চয়ই মাথা খাটিয়ে মরছে ওরা। হুইল বন্ধ করে নোঙর কেটে দেয়ার জন্যে ইশারা করলাম রুফিসকোকে।

সাকিম বন্দুক নিয়ে পাহারায় রইলো, হোলড থেকে মালপত্র বের করে এনে ডিঙিতে নামিয়ে দিলাম আমি। তারপর তিনজনে মিলে স্টোরে গিয়ে বিসকুট, নোনা মাংস ইত্যাদি সংগ্রহ করে আনলাম। যাবার সময় বেরিম্যান আর ডার্কলিংয়ের হাত-পা-মুখ বেঁধে রাখতে ভুল হয়নি।

'এখানে অপেক্ষা করো,' নির্দেশ দিলাম ওদের। 'চোখ-কান খোলা রাখবে। আমি ক্যাপটেনের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি।'

'কী !' অকৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করলো রুফিসকো। 'ব্যাটা সঙ্গে পিস্তল নিয়ে ঘুমোয়।'

'তাতে কী,' আমি বললাম, 'ওর সাথে আমার একটা বোঝাপড়া আছে।'

পেছনের সিঁড়ির তিনটে ধাপ টপকে আফটার কেবিনে ঢুকলাম। হাত-পা ছড়িয়ে বাংকে ঘুমুচ্ছে ক্যাপটেন। পাশে খালি বোতল গড়াগড়ি খাচ্ছে। রামের কটু গন্ধ ভাসছে বাতাসে। উলটো দিকের দেয়ালে আমার তলোয়ারটা ঝুলছিল, ওটা পেড়ে আনলাম।

রুফিসকোর কথা সত্যি, ক্যাপটেনের হাতে একটা পিস্তল রয়েছে। ওটা ছিনিয়ে নিয়ে পা দিয়ে খোঁচা মারলাম ওর গায়ে।

'ওঠো!' ডাকলাম ওকে, 'আমার পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দাও এবার।'

কেঁপে উঠলো লিনেকার, পিটপিট করে চোখ মেললো, এ-বার জাহাজ থেমে আছে টের পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলো বিছানায়, গায়ের চাদরটা ফেলে দিয়ে একটা পা রাখলো মেঝেতে। তারপর আমাকে দেখতে পেলো সে, পিস্তল আর তলোয়ারটাও চোখে পড়লো।

'তুমি!' দাঁড়াবার চেষ্টা করলো ক্যাপটেন, তলোয়ার উঁচিয়ে ধরলাম আমি। 'বিদ্রোহ?' প্রশ্ন করলো লিনেকার।

'না, আমি তোমার দলের লোক নই, ক্যাপটেন। সুতরাং বিদ্রোহের প্রশ্নই ওঠে না। আমাকে জোর করে ধরে এনেছো। সামনেই ডাঙা, আমি নেমে যাচ্ছি।'

'জংলীরা তোমাকে কাবাব বানিয়ে খাবে,' ভয় দেখালো সে।

'আমাকে খাবে, তোমাকে নয়,' নির্লিপ্ত সুরে বললাম। 'তা, ক্যাপটেন, এখন আমার হিসেব চুকিয়ে দাও। আমার টাকাপয়সা কেড়ে নিয়েছো, সেগুলো তো দেবেই, উপরন্তু পারিশ্রমিক আর ক্ষতিপূরণও দিতে হবে।'

'ক্ষতিপূরণ! দাঁড়া, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন!'

তেড়ে আসতে গেল সে, ওর বুকে তলোয়ার ঠেকিয়ে সামান্য চাপ দিলাম আমি।

ব্যথায় ককিয়ে উঠলো লিনেকার, পিছিয়ে গেল, শার্টের সামনের অংশে রক্তের ছোপ লাগলো। 'আমার টাকাটা, ক্যাপটেন। আর-গুলোর বিনিময়ে জিনিস নেবো।'

শার্টের পকেট থেকে টাকার থলেটা বের করে ছুঁড়ে দিলো সে। শূন্যেই ওটা ধরে ফেললাম। ওজন অনুভব করে ঠিক আছে বলেই মনে হলো।

'আমার সময়ের মুল্য আছে, তোমার এই জাহাজের চেয়েও বেশি। সেটা আর নিচ্ছি না। তবে,' আমি বললাম, 'চারশো পাউনড পণ্য এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু গুলি আর গানপাউডার দিতে হবে।'

'চা-র-শো পা-উ-ন-ড!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো লিনেকার। 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'বেশ, তোমার নিয়মেই হোক। পাঁচশো পাউনড।'

কঠিন চোখে তাকালো লিনেকার। 'ভুল হয়ে গেছে, প্রথম দিনই তোকে সমুদ্রে ফেলে দেয়া উচিত ছিলো।'

'তাই,' উৎফুল্ল স্বরে জবাব দিলাম। 'তবে তোমার বিপদ আরো বাড়তো তাতে, ক্যাপটেন টমাস তোমাকে রেহাই দিতেন না। শোনো, লিনেকার, তোমার ইংল্যানডে ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।'

'মানে? কী বলতে চাও?'

'এতক্ষণে সবাই জেনে গেছে আমাকে অপহরণ করেছো তুমি। ইংল্যানডে হাতকড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে ওরা।'

ব্যাপারটা আদৌ পছন্দ হলো না তার। তবু আমার কথা বিশ্বাস না করার ভান করলো।

'বাহ্ !' গরগর করে উঠলো সে। 'কোন দুঃখে তোর খোঁজ করতে যাবে ওরা! তুই হাওড়ে একটা সাধারণ চাষী বৈ কিছু নোস।'

আমার কাজে আসবে এমন কয়েকটা ছোটখাটো জিনিস আছে কেবিনে। একটা কমপাস এবং আরো দুটো পিস্তল তুলে নিলাম। বিস্ফারিত চোখে আমার কাণ্ড-কারখানা লক্ষ্য করছিল ক্যাপটেন, 'ব্যাটা, চোর!' হুঙ্কার দিলো সে।

'ভবিষ্যতে কারো মাথায় বাড়ি দেয়ার আগে আজকের ঘটনাটা স্মরণ করো, লিনেকার। আমি চলে গেলেও তোমার নিস্তার নেই। টমাস আসছেন। উনি তোমাকে চেনেন।

'আমাকে যে-রাতে অপহরণ করলে তার পরের দিন আর্লের সাথে আমার দেখা করার কথা ছিলো। ভদ্রলোক গেনেসটারের চাচা। আমাকে নিয়ে তাঁর কিছু প্ল্যান আছে। ক্যাপটেন টমাসও এতে জড়িত। সত্যি, লিনেকার, এবার তুমি গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছো।'

দরকারি জিনিসগুলো নিয়ে দরজার কাছে পিছিয়ে গেলাম 'বাইরে আসার চেষ্টা করো না, লিনেকার। মারা পড়বে।'

'টমাস তোকে খুঁজে পাবে ভেবেছিস,' ঘেউ করে উঠলো সে। 'এই জায়গার হদিস কেউ জানে না। এমনকি গসনলড, নিউপোর্টও নয়। একবার জাহাজ থেকে নেমে গেলে কেউ তোর খোঁজ পাবে না।'

'আসল কথাটা কেন বুঝতে চাইছো না, লিনেকার। আপাতত কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চাই আমি। যতদিন না তোমার ফাঁসি হচ্ছে। অনেক অভাগা লোকের মৃত্যুর কারণ হয়েছো তুমি, এখন আমার জন্যে তোমাকে মরতে হবে।'

'তুমি ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারো, অ্যালান।' লাল চোখে

আমার দিকে তাকালো সে। 'তবে জংলীদের হাত থেকে পার পাবে না।'

বাইরে থেকে দরজাটা আটকে দিয়ে ওপরে উঠে গেলাম আমি। কোনো সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ আঁধার ফুঁড়ে সাকিম এগিয়ে এলো। 'অ্যালান, আমাদের বোধ হয় এক্ষুণি ডাঙায় চলে যাওয়া উচিত। নিচে একটা কিছু ঘটছে বলে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, চলো।' কথা বলার ফাঁকে অতিরিক্ত মালগুলো বাঁধার জন্যে দড়ি জোগাড় করলাম আমি। নিরেট অন্ধকার, আকাশে তারা নেই। লোকমুখে টুকরো কথাবার্তা যা শুনেছি, এই উপকূলে প্রায়ই ভয়ঙ্কর ঝড় হয়।

প্রথমে সাকিম দড়ি বেয়ে নেমে গেল, তার পেছনে রুফিসকো। আমি সবে এক পা দিয়েছি রেলিংয়ের ও-পাশে, এমন সময় তেড়ে এলো ওরা। ফরোয়ার্ড ডেকে একটা চোরাপথের সন্ধান পেয়ে সবাই লুকিয়েছিল ওখানে। ওই পথটার ব্যাপারে কিছুই জানা ছিলো না আমার। ফলে বিপদ টের পাবার আগেই চকিত হামলা হলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে কেবিনের দরজা ভেঙে ডেকে এসে হাজির হলো গ্যারি লিনেকার। হাতে পিস্তল। ওটা সে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল জানি না, তবে আমি আর দেরি না করে গুলি চালালাম, তারপর দড়ি বেয়ে নেমে গেলাম ডিঙিতে।

চোখের পলকে লিনেকার রেলিংয়ে এসে দাঁড়ালো, ধীরে-সুস্থে টিপ করলো। কিন্তু ততক্ষণে নৌকোর বাঁধন কেটে দিয়েছে সাকিম, প্রাণপণে দাঁড় বেয়ে সামনে যাওয়ার বদলে পেছনে সরে গেল রুফি-সকো। এবং ওর বুদ্ধিতে এ-যাত্রা আমি প্রাণে বেঁচে গেলাম।

লিনেকারের পিস্তল গর্জে উঠলো, আমার সামনে বোটের গায়ে

এসে লাগলো গুলি।

রুফিসকো পাল খাটালো, অনুকূল বাতাসে তরতর করে এগিয়ে চললো ডিঙি। আমি মশাল জ্বেলে লিনেকারের প্রতি নজর রাখলাম গুলি ছোঁড়া বন্ধ করেছে সে, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার পানে।

শেষবারের মতো জলি জ্যাকের দিকে তাকালাম আমি। ধীরে ধীরে ওটার মুখ ঘুরে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে। লিনেকার ঝানু নাবিক, চড়ায় আটকা পড়ার সাধ তার নেই। চোখ ফিরিয়ে নিলাম—জাহাজ সমুদ্র স্বদেশ, সব পেছনে পড়ে রইলো। আমার সামনে এখন এক বিশাল মহাদেশ। অসভ্যদের বাস এখানে, ওদের সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। এখান থেকে কবে কীভাবে পালাবো, ডাঙায় আমাদের কপালে কী আছে—তাও বলতে পারছি না।

হামাগুড়ি দিয়ে সাবধানে পেছনে গিয়ে হাল ধরলাম। সামনে, বাঁয়ে তীরে ঢেউ আছড়ে পড়ার আওয়াজ পাচ্ছি। আর কোনো শব্দ নেই, নীরব নিশুতি রাত।

ঘাড় ফেরালো সাকিম। 'এবার?'

খানিক ইতস্তত করে জবাব দিলাম, 'ভোর হবার আগেই এগুলো লুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর ঘুরে দেখবো জায়গাটা কেমন।'

আমার পরিকল্পনা ফার ব্যবসায় ধনী হয়ে দেশে ফিরবো। কিন্তু ইংল্যানডকে এখন মনে হচ্ছে বহু, বহুদূরে; এই মুহূর্তে সামনে রয়েছে এক দেশ—বিশাল, অজানা, রহস্যময়। এই দেশ আমার নিয়তি।

আমাকে কোনো বংশ প্রতিষ্ঠা করতে হলে এখানে, এই দেশেই করতে হবে। আর এখানে উন্নতি করতে চাইলে এই মাটির দাবী

মিটিয়ে চলতে হবে। সেই অনাগত সন্তানেরা এখানে, এই আমেরিকায়, ওসমান বংশের আবাস গড়ে তুলতে এগিয়ে আসবে একদিন তাতে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

আট

আবছা দেখা যাচ্ছে তীর; আমাদের ডানে, অনতিদূরে, একটা অস্পষ্ট শাদা রেখা। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ডাঙায় যেতে চাইছি না আমি। আগে আমাদের এমন কোনো ইনলেট বা খাঁড়ি খুঁজে বের করতে হবে, যেখানে লুকিয়ে থেকে পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করতে পারবো।

বো-র আঘাতে সরে যাচ্ছে পানি, ফসফর‍্যাসের কণা খেলা করছে ঢেউয়ের মাথায়, পতপত করে পাল উড়ছে, আর পাথরের মূর্তির মতো নীরবে বসে আছি আমরা—ভবিষ্যতের ভাবনায় মন উথাল-পাথাল করছে। আমাদের ডানে সেই অদ্ভুত দেশ, শতবছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে অথচ আজো তার অনেক কিছুই অজানা রয়ে গেছে। টালিস একটা বিশাল নদীর কথা বলেছিল, হারনানদো দ্য সোতো আবিষ্কার করেছেন। ওই রহস্যময় নদীটার নাকি কোনো আদি-অন্ত নেই। কথাটা মনে পড়তে গা ছমছম করে উঠলো।

'ভয় করছে,' মৃদু সুরে বললাম। 'এক অচিন দেশে যাচ্ছি।'

'এটা কিন্তু সুলক্ষণ,' বললো সাকিম। 'অতিসাহস ভালো নয়। এক-আধটু ভয় মানুষকে চিন্তা করতে সাহায্য করে।'

'এখানকার জংলীদের দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করবো আমরা,' বললাম। 'তবে সেই সঙ্গে শ্রদ্ধার ভাবও থাকবে। ওদের বুঝিয়ে দেবো আমরা ভীত নই এবং সৎভাবে ব্যবসা করতে চাই।'

তাজা হাওয়ায় পাল ফুলে উঠেছে, তীর থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে এগিয়ে যাচ্ছে ডিঙি। সহসা মিলিয়ে গেল ডাঙা, একটা উপসাগরের মুখে এসে পড়লাম আমরা। হাল ঘুরিয়ে নৌকোটা ভেতরে নিয়ে গেলাম আমি।

এখন একটা আশ্রয় দরকার, ভাবলাম। এই উপকূল সম্বন্ধে আমার সামান্য যা জ্ঞান সেটা খুব আশাব্যঞ্জক নয়—হরহামেশা প্রবল জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে এখানে, সমুদ্রের চেহারাও ভয়ানক রুদ্র।

এটাই আমার সেই উপকূল কি না নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারছি না। আমাদের চার্টগুলো কাঁচাহাতের, কেউই গোটা এলাকা পাড়ি দেয়নি।

হাওড় থেকে প্রায়ই নৌভ্রমণে বসটনে যেতাম আমরা। সেখানে আমি এটুকু জেনেছি যে আটলানটিক একটা বিরাট বাধার মতো হলেও একেবারে অলজ্ঘনীয় নয়। আয়ারল্যানড থেকে পাড়ি দেয়া বিশেষ কঠিন নয়। কলামবাসের 'আবিষ্কার' এর কথা শুনে বহু আইরিশ, ইংরেজ এবং ব্রিটন নাবিকদের হাসতে দেখেছি। ওদের কাছে এটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার, প্রায় একশো বছর হলো গ্র্যানড ব্যাংকস-এর অদূরে মাছ ধরছে ওরা।

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে, ধূসর উপকূলরেখা এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। বালুতে চিকচিক করছে ঢেউয়ের ফেনা। এটা কোনো উপসাগর বা প্রণালী হবে—দক্ষিণে অগাধ জলরাশি, পশ্চিমে তীর,

সারি সারি গাছ দাঁড়িয়ে আছে।

ডাঙায় প্রাণের কোনো চিহ্ন দেখতে পেলাম না, ক্ষীণতম ধোঁয়ার রেখাও চোখে পড়লো না। তবে এখানে যে আদিবাসী রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

মৃদু স্বরে ডাকলো রুফিসকো। 'ওই যে! একটা খাঁড়িমত দেখা যাচ্ছে।'

হাল ঘুরিয়ে দিলাম আমি, বাতাসের ধাক্কায় দ্রুত ডাঙার দিকে এগিয়ে গেল ডিঙি। অচিরেই খাঁড়ির কাছে চলে এলাম, পাশে বাঁকা চাঁদের মতো বালিয়াড়ি। অদূরে আরেকটা ছোট খালের প্রবেশমুখ চোখে পড়লো। সাকিম পাল নামিয়ে ফেললো, দাঁড় বেয়ে ওই খালে ঢুকে পড়লাম আমরা। কিছুদুর যেতে একটা বিশাল মরা গাছ দেখতে পেলাম, ভেঙে অর্ধেকটা পানিতে পড়েছে। ওই গাছের সাথে ডিঙিটা বেঁধে ফেললাম।

গান গেয়ে উঠলো একটা পাখি, আলোড়ন সৃষ্টি হলো জলে। মাথার ওপর দিয়ে একটা গাংচিল উড়ে যাবার সময় কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালো আমাদের দিকে।

তলোয়ারটা কোমরে ঝুলিয়ে নিলাম আমি। পিস্তলগুলো বেলটে গুঁজে রেখে বন্দুকটা হাতে নিলাম।

'শব্দ করো না।' হুঁশিয়ার করে দিলাম। 'আমরা একা, আগে এখানকার পরিস্থিতি বুঝতে হবে।'

চারদিক সতর্ক দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে ডাঙায় পা রাখলাম। বেশির ভাগ পাইন গাছ, প্রাচীন ঝুরিবহুল ওকও রয়েছে। কিছু নাম-না-জানা ঝোপ চোখে পড়লো। স্রোতে ভেসে-আসা গুঁড়ি পড়ে আছে এখানে-সেখানে।

আমাদের অবস্থানটা বেশ সুরক্ষিত বলেই মনে হলো। একটা সরু অথচ গভীর খাল বালুপাহাড় বেয়ে খাঁড়ির অপর পারে চলে গেছে। এক একরের মতো জায়গা ঢালু হয়ে খালে মিশেছে। চারপাশের নিবিড় গাছপালা আড়াল করে রেখেছে বাইরের দৃষ্টি।

'আগুন জ্বালাবে না,' বললাম আমি। 'বিসকুট খেয়ে থাকবো।'

রুফিসকো বিসকুট আনতে ডিঙিতে গেল, আশপাশ ঘুরে দেখতে গেল সাকিম। অল্পক্ষণ পরে ফিরে এলো সে। 'একটা ঝরনা আছে, মোটামুটি ভালো পানি।' কয়েকটা ভাঙা ডাল দেখলাম ওর হাতে। 'তীর-ধনুক বানাবো,' সাকিম বললো।

যৎসামান্য খেলাম আমরা, টান পড়ার ভয় আছে। সাকিম তীর-ধনুক বানাতে বসলো। আমি পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা হলাম।

ওপরে উঠে দুচোখ জুড়িয়ে গেল। সমুদ্রের দিকে, দক্ষিণে বিশাল খাঁড়ি—মাঝখানে ছোট ছোট বালুদ্বীপ প্রাচীর সৃষ্টি করেছে। দিগন্তে কোনো পালের চিহ্নমাত্র চোখে পড়লো না। তবে এত সহজে গ্যারি লিনেকারের কবল থেকে ছাড়া পাবো বলে বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। ও হাল ছাড়ার পাত্র নয়।

আরো দূরে, তীরের এক জায়গায় পোড়া কাঠ পড়ে আছে। কিছু শামুকের খোল ছড়িয়ে রয়েছে আশপাশে। ইনডিয়ানরা, বা যারা ওই আগুন জ্বেলেছিল, খেয়েছে।

তীর ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা ভেতরে শুরু হয়েছে তৃণভূমি। চমৎকার জায়গা, ভবিষ্যতে কৃষকদের জন্যে আদর্শ স্থান হয়ে উঠবে এই অঞ্চল। সম্প্রতি এ-দিকে কোনো মানুষের পা পড়েছে বলে মনে হলো না।

অসংখ্য বুনো হাঁস জলকেলী করছে, বারদুয়েক কয়েকটা বাদামি

রঙের পাখি ডানা ঝাপটে আকাশে উড়লো। গায়ে শাদা শাদা ফুটকি, আকারে প্রায় রাজহাঁসের সমান। এরাই বোধ হয় গসনলডের সেই টাকি।

একটু বাদে ঝরনার পাড়ে নেমে এলাম, বহু নিচে আমাদের ক্যাম্প। এক নজর দেখেই বুঝলাম কোনো সুউচ্চ পাহাড়ী অঞ্চলে এর উৎপত্তি হয়নি, ওটা আর কোথাও হবে।

গোটা এলাকাটা জরিপ করতে আরেকবার ওপরে উঠলাম আমি। প্রথমে আমাদের একটা নদী খুঁজে বের করতে হবে, নৌকো নিয়ে উজানে কিছুটা ভেতরে গিয়ে ঘাঁটি গাড়বো। আমাদের অর্ধেক জিনিস এমন কোথাও পুঁতে রাখবো যেখানে সহজে কারো চোখে পড়বে না। আক্রান্ত হলে কোনো অবস্থাতেই পুরোটা খোয়ানো চলবে না। তারপর আমি কোনো শক্তিশালী গোত্রপতির সঙ্গে দেখা করে তার সাথে মৈত্রী স্থাপন করবো এবং নদীতীরে শহর গড়ে তোলার জন্যে স্থান নির্বাচন করবো।

জায়গাটাকে হতে হবে নদীর মোহানা এবং সমুদ্রের কাছাকাছি কোথাও, যেখানে ইনডিয়ানরা সচরাচর আসে, আবার জাহাজ নিয়েও সহজে পৌছুনো যায়। নদীর মোহানাতেই একদা রোমের যাত্রা শুরু হয়ে ছিল, লনডনেরও তাই।

এখন আমরা একটা মুক্ত-স্বাধীন জায়গায় এসেছি। আমাদের ইচ্ছেতেই এখানকার নিয়ম-কানুন গড়ে উঠবে। যারা আমার পরে আসবে, তারা, আমার মতোই, নিরাপদ ঠাঁই খুঁজবে এখানে।

বেশ খোলামেলা জায়গা। লনডনের জনাকীর্ণ রাস্তা, সেখানকার দরিদ্র মানুষের কথা মনে পড়লো। গাঁয়ে, পড়শিদের মাঝেও জমি নিয়ে কাড়াকাড়ি হতে দেখেছি। ওরা এখানে আসলেই তো হয়।

মুষ্টিমেয় কয়েকজন লর্ডকে সবটা দেয়া হবে না ; প্রত্যেকেই একখণ্ড করে জমি পাবে—সেই জমিতে ওরা সোনা ফলাবে।

সহসা নিচে নড়াচড়ার আভাস পেলাম। চারজন জংলী নিঃশব্দে আমাদের ক্যামপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওদের হাতে তীর-ধনুক।

ওরা চারজন, আমরা তিনজন, তাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি—সাকিম বা রুফিসকো, কেউই ওদের আগমনের খবর জানে না।

চারজন···মুখে রং, যুদ্ধের সাজ নিয়েছে। এর কথা আমি শুনেছি।

বেশ সুবিধেজনক অবস্থানে রয়েছি আমি। সামনে একটা বিশাল ওকের গুঁড়ি পড়ে আছে, আমার মতো দুটোর সমান মোটা। চারদিকে এ-রকম আরো গাছ রয়েছে, সহজে কেউ দেখতে পাবে না।

এখন উপায় ? আমাকে দেখেনি এমন কাউকে গুলি করতে বিবেকে বাধছে, অথচ সুযোগ পেলে আমাকে খুন করতে দ্বিধা করবে না ওরা। আবার যেতে দিলে আমার বন্ধুদের মেরে ফেলবে।

পেছনে শুকনো পাতার মচমচ শব্দে ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালাম। একজন ইনডিয়ান, আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাত তুলে বললো, 'বন্ধু।' তারপর নিচের চারজন যোদ্ধাকে দেখালো। 'শত্রু।'

জঙ্গলের ভেতর থেকে জনাছয়েক ইনডিয়ান বেরিয়ে এসে পাহাড়ের অপর দিকে চলে গেল। আমার পানে ভ্রূক্ষেপ করলো না।

'আমি অ্যালান,' বললাম। 'ব্যবসা করতে এসেছি।'

'আমার নাম পোটাকা। শেতাঙ্গদের সাথে এর আগেও বহুবার কথা বলেছি। আমি তোমাদের বন্ধু।'

'আমার সাথে দুই বন্ধু আছে।' দুআঙুল তুলে দেখালাম। 'ওখানে।' ক্যামপের দিকে ইশারা করলাম। 'ওদের মেরো না।'

লোকটা চলে গেল, আমি বসে রইলাম। ধীর লয়ে বয়ে যাচ্ছে

সময়, হঠাৎ একটা পিলে-চমকানো আর্তচিৎকার ভেসে এলো, তারপর মনে হলো কেউ ছুটে আসছে এ-দিকে।

আচমকা ঝোপ ভেঙে একটা ইনডিয়ান বেরিয়ে এলো। নিচের ট্রেইলে একটু আগে ওকে দেখেছি। ওর বাহুতে জখমের দাগ, হাতে রক্তাক্ত ছুরি।

আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো সে, যেন বাজ পড়েছে মাথায়। কঠিন চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। বিড়বিড় করে কী যেন বললো লোকটা, তারপর পালিয়ে গেল। নিশ্চয়ই আমাকে দেখে তাজ্জব হয়েছে।

দৌড়ে ফিরে এলো পোটাকা। 'কেউ এসেছিল?'

'ওই দিকে গেছে,' আমি বললাম।

দোটানায় পড়লো পোটাকা, তারপর ছুরি কোমরে গুঁজে রাখলো। 'ঢের হয়েছে। আমরা দুটোকে খতম করেছি।'

'চমৎকার ইংরেজি বলো তুমি।'

ওর বত্রিশপাটি দাঁত বেরিয়ে পড়লো এক সাথে। 'আমি ইংরেজ-দের বন্ধু। স্প্যানিশদের মোটেও সহ্য করতে পারি না। সুযোগ পেলেই ওরা যুদ্ধ করে আমাদের সাথে।'

'তোমাদের গ্রাম কোথায়? কাছেই?'

'না, দূরে···দুই ঘুমের পথ।' স্থলভাগ দেখালো সে। 'তুমি যাবে?'

'পরে।'

এদিক-ওদিক তাকালো পোটাকা। 'তোমরা মোটে তিনজন?'

'আজ-কালের মধ্যে আমাদের জাহাজ ফিরে আসবে,' সহজ গলায় বললাম। 'ইনডিয়ানদের সাথে বন্ধুত্ব পাতানোর জন্যে আমাদের পাঠানো হয়েছে। আমরা ব্যবসা করতে চাই। ছুরি, সুঁচ, কাপড়

এগুলোর বিনিময়ে ক্ষার নেবো।'

'আমাদের গাঁয়ে এসো। ওদের কাছে যেও না। ওরা খুনে।'

মাঝারি গোছের উচ্চতা, চমৎকার স্বাস্থ্য। গায়ের রং অনেক পর্তুগীজের চেয়ে ফরসা। চলাফেরায় ক্ষিপ্র। চেহারায় বন্ধুত্বের ছাপ। লোকটাকে পছন্দ হলো আমার।

'এক ইংরেজ থাকতো আমাদের গাঁয়ে···'

'এখন নেই?'

'না। বছরপাঁচেক ছিলো। তারপর বললো পাহাড়ের ও-পাশে যাবে। সেও আজ প্রায় ছ-সাত মাস আগের কথা। এতদিনে বোধ হয় মরে গেছে।'

আমার বেল্ট থেকে একটা ভোজালি বের করলাম। ভীষণ ধারালো, এক হাত লম্বা। ভোজালিটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'নাও, তোমার জন্যে, বন্ধু।'

সহসা হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো সে। ধুলোতে আঙুল দিয়ে নদী আঁকলো, সেখান থেকে একটা ট্রেইল চলে গেছে ভেতরে। 'এই আমাদের গ্রাম,' পোটাকা বললো। 'তুমি এসো।'

তীর-ধনুক কুড়িয়ে নিলো সে। 'আসবে কিন্তু,' আরেকবার বললো, তারপর চলে গেল।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমি, কোনো জনমানবের সাড়াশব্দ না পেয়ে ফিরে গেলাম ক্যাম্পে। রুফিসকো অভ্যর্থনা জানালো আমাকে। উইলো ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো সাকিম।

'লড়াই বেধেছিল?' জিজ্ঞেস করলো রুফিসকো।

'ইনডিয়ানদের মধ্যে,' জবাব দিলাম, 'ওদের একজনের সাথে

আমার খাতির হয়েছে।'

'ওদেরকে বিশ্বাস করি না আমি,' অসন্তোষ প্রকাশ পেলো রুফিস-কোর সুরে। 'সব জংলীভূত।'

'কাদের জংলী বলছো?' বিস্ময় প্রকাশ করলাম আমি। 'এটাও আসলে আরেক ধরনের জীবনধারা। আমরা একটু সতর্ক থাকলেই চলবে। আর তাতে যদি কাজ নাই হয়—যুদ্ধ করবো।'

পরদিন।

পোটাকার গ্রামের দিকে রওনা হয়েছি আমরা। যতই অগ্রসর হচ্ছি নদীর দুপাশের প্রাকৃতিক শোভা দেখে মুগ্ধ হচ্ছি। কত বিচিত্র গাছ যে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে উইলো আর অলডারই বেশি। বীচ, টিউলিপ, পপলার, কয়েক রকমের পাইন, সাইক্যামোর, অ্যাশ এগুলোও আছে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গতরাতে তুমুল বৃষ্টি হয়েছে। সেই অবসরে আরো কিছুটা ভেতরে সরে এসেছি আমরা। ভোরের দিকে, সাকিম আর রুফিসকো যখন ঘুমোচ্ছিল, আমি ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। তখন সমুদ্র তীরের কাছাকাছি একটা ছোট গুহামত আবিষ্কার করেছি। রওনা হবার আগে আমাদের মালপত্র ওখানেই লুকিয়ে রেখে এসেছি।

অ্যাশ গাছ দেখে বড় তীর-ধনুক বানাবার কথা মনে পড়লো আমার। এতে যেমন নিঃশব্দে শিকার করা যাবে, তেমনি আমাদের গানপাউডারও মজুদ রাখতে পারবো।

এরই মধ্যে বারকয়েক ধোঁয়ার রেখা চোখে পড়েছে, একবার একটা গ্রাম পেরিয়ে এলাম। দূর থেকে ঘরগুলোকে ছনের বলে মনে হলো।

তীরে কয়েকটা ক্যানো বাঁধা রয়েছে। আমাদের দেখে গাঁয়ের কুকুর-গুলো হল্লা জুড়ে দিলো, তেড়ে এলো তীর অবধি।

কিন্তু ততক্ষণে আমরা অনেকটা সরে এসেছি, একটা বাঁকের মুখে পৌঁছে আমি পেছনে তাকালাম। জনাকয়েক ইনডিয়ান বেরিয়ে এসেছে কুটির থেকে, চেয়ে আছে এ-দিকে। ওরা পুরুষ না মহিলা এতদূর থেকে ঠাওর করতে পারলাম না।

'আমাদের দেখতে পেয়েছে নাকি?' প্রশ্ন করলো রুফিসকো।

'বোধ হয়,' আমি বললাম, 'তবে দেরিতে।'

কথা বলছি কিন্তু আমার দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ। নদী এখানে সরু হয়ে আসায় বিপজ্জনকভাবে কূলের কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা।

'অ্যালান। দেখো।' হঠাৎ মুখ খুললো সাকিম।

ওর ইশারা লক্ষ্য করে দেখলাম ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ইনডি-য়ানরা ছুটে যাচ্ছে। ওদের গন্তব্য পরবর্তী বাঁক, ওখানে আমরা পাড়ের খুব কাছাকাছি চলে যাবো।

বাঁকের কাছে কোনো ইনডিয়ান চোখে পড়লো না আমার, শুধু কয়েকটা বিশাল মরা গাছ পানিতে পড়ে আছে। এর ফলে জায়গাটা আরো বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এখন অনুকূল বাতাস আমাদের এক-মাত্র ভরসা। 'দাঁড় রেডি রাখো,' রুফিসকোকে বললাম, 'আমাদের প্রয়োজন হবে ওগুলো।'

বন্দুকটা তুলে নিয়ে দেখলাম গুলি আছে কি না, তারপর আবার নামিয়ে রাখলাম। নিতান্ত ঠেকে না পড়লে লড়াই করবো না।

স্থিরভাবে হাল ধরে আছি আমি, দৃষ্টি ডাঙার দিকে। ইনডিয়ানদের পাত্তা নেই।

আরো এগিয়ে গেলাম···আরও। সাকিম তার মাসকেটে হাত

রাখলো।

এখন পর্যন্ত কোনো ইনডিয়ানের দেখা নেই। খাঁখাঁ বালিয়াড়ি। অদূরের ঝোপঝাড়েও নড়াচড়ার আভাস পাচ্ছি না। উজানের দিকে তাকালাম, কোনোমতে ওই ফাঁকটা পেরিয়ে যেতে পারলে···

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো রুফিসকো। আমি পেছনে তাকিয়ে দেখলাম তিনটে ইনডিয়ান বেরিয়ে এসেছে ঝোপ থেকে, দৌড়ে আসছে এই-দিকে ওদের পেছনে আরেকজন···তারপর আরো একজন।

আচমকা থমকে দাঁড়ালো প্রথমজন, তীর ছুঁড়লো। দূরত্ব ঠিকই ছিলো, কিন্তু তাড়াহুড়ো করায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অ্যাসটার্নে পড়লো।

দ্বিতীয় তীরটা আমার সামনে-রাখা থলেতে আঘাত করলো, তৃতীয়টা চলে গেল মাথার ওপর দিয়ে। রুফিসকো মাসকেট ছুঁড়লো।

বিকট শব্দে তালা লেগে গেল কানে। চিৎকার করে একটা ইনডিয়ান লুটিয়ে পড়লো। আবার গুলি ভরে নিলো রুফিসকো। ইনডি-য়ানটা ওঠার চেষ্টা করছে, ওর উরুতে গুলি লেগেছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে পা। পড়ে গেল সে, দাঁড়িয়ে পড়লো অন্যরা, ভয়চকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

মাসকেট নামিয়ে রেখে সজোরে দাঁড় টানতে লাগলো রুফিসকো। বাতাস পেয়ে ফুলে উঠলো পাল, আমরা ওদের নাগাল থেকে বেরিয়ে এলাম।

রুফিসকোর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, বিস্ফারিত চোখে তাকালো সে। 'অ্যালান, আমাদের হত্যা করতে চাইছিল কেন ওরা?' ভয়ে ওর গলা ঈষৎ কেঁপে গেল।

'আমরা অচেনা লোক বলে। তাছাড়া আমাদের কাছে যে-সব জিনিস রয়েছে সেগুলো ওদের দরকার। এটাই দুনিয়ার রীতি,

রুফিসকো, সবল দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে।'

'কিন্তু আমরা তো ব্যবসা করতে এসেছি।'

'বিলকুল সত্যি, তবে জলদস্যুরা যে-সব জাহাজ লুট করেছে তারাও কিন্তু এ-জন্যেই এসেছিল। আমরা যেখানে সুবিধে পাবো, ব্যবসা করবো। কিন্তু প্রথমে আক্রান্ত না হলে গায়ে পড়ে লাগতে যাবো না কারো সঙ্গে।'

'ওরা তা করবে না?'

'কী জানি।'

তরতর করে উজান বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ডিঙি। এক জায়গায় নদী দুটো শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে। আমরা ডানে মোড় নিলাম। এ-দিকটায় নিচু পাড়; জংলা ঘাস আর ইতস্তত-ছড়ানো গাছপালায় পরিপূর্ণ। শান্ত নিস্তব্ধ প্রকৃতিতে পালের পতপত শব্দ এক অনির্বচনীয় মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। সহসা হু-হু করে উঠলো মনটা—জগৎ-সংসারে আমার আপন বলতে কেউ নেই, কেউ না। ডানা ঝাপটে একঝাঁক গাংচিল আকাশে উড়লো।

কাছেপিঠে কোনো ইনডিয়ানের ছায়াও নেই, তবে দুবার হরিণ চোখে পড়লো, আর অজস্র পাখি।

হঠাৎ একটা জিনিসের কথা মনে পড়লো। আমাদের ক্যাম্পফায়ারের ধারে মিহি ছাই পড়েছিল।

পটাশ…

ইংল্যানডে এর বাজার আছে। শুধু ফারের ভরসায় না থাকলেও চলবে, লাকড়ি পুড়িয়ে পটাশ মিলবে। মামুলি জিনিস, কিন্তু প্রয়োজনীয়।

আচমকা সাকিমের চিৎকারে আমার দিবাস্বপ্ন টুটে গেল। একটা

বাঁকের মুখে এসে পড়েছি আমরা, দশ-বারোটা ক্যানো ধেয়ে আসছে —আমাদের পালাবার কোনো রাস্তা নেই। জনাচল্লিশেক লোক… প্রত্যেকেই সশস্ত্র।

'দাঁড়াও!' তীক্ষ্ণ স্বরে বললাম আমি। 'গুলি করবে না!'

নয়

প্রাথমিক ভয়টা কেটে যেতে লক্ষ্য করলাম ওরা কোনো রং মাখেনি। ইনডিয়ানদের এই যুদ্ধের সাজ নিয়ে ইংল্যানডে বহু গল্প চালু রয়েছে।

'অস্ত্রপাতি লুকিয়ে রাখো,' বললাম, 'গানলের নিচে। ওদেরকে শান্তিপ্রিয় বলে মনে হচ্ছে।'

ক্যানোগুলোর গতি কমে এলো, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। হাত নাড়ছে একজন—পোটাকাকে চিনতে পারলাম আমি।

'আমার বন্ধু,' ব্যাখ্যা করলাম।

বিরক্তি প্রকাশ করলো রুফিসকো। 'একজন ইনডিয়ান তোমার বন্ধু হতে পারে না। বন্দুকটা বরং তৈরি রাখো।'

হাত তুলে আমিও শান্তির সঙ্কেত দেখালাম। পোটাকা কাছে এগিয়ে এলো। বন্দুকগুলো ওর চোখে পড়েছে কি না বুঝতে পার-

লাম না, হাবভাবে তেমন কিছু ফুটে ওঠেনি।

'আমাদের গাঁয়ে এসেছো?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'হ্যাঁ,' আমি বললাম।

'গুড।'

অন্যদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে ও কিছু বলতে ক্যানোগুলোর মুখ ঘুরে গেল, আমাদের নিয়ে বাড়ির পথ ধরলো ওরা।

দখিনা বাতাসে মেঘ কেটে গেছে, সূর্যকিরণে চিকচিক করছে নদীর জল। আমাদেরকে ঘিরে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ক্যানোগুলো, একলয়ে ওঠা-নামা করছে ইনডিয়ানদের হাত।

দীর্ঘ যাত্রা, নীরবে ওদের অনুসরণ করছি, এছাড়া কোনো গতিও নেই। বন্ধুসুলভ ব্যবহার পাচ্ছি, তবে সেটা কতটা খাঁটি কে জানে।

রাতে ডাঙায় আশ্রয় নিলাম, প্রচুর পরিমাণে হরিণের মাংস খেতে দিলো ওরা। ইংল্যানডে একমাত্র বড় বড় লর্ড ছাড়া এত সুস্বাদু জিনিস চোখে দেখতে পায় না কেউ।

ইনডিয়ানরা নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টায় মশগুল হয়ে আছে। ওদের কারো স্বাস্থ্যই পেশীবহুল নয়, খর্বকায় দেহ। কুস্তিতে এদের যে-কাউকে, সম্ভবত যে-কোনো দুজনকে, হারাতে পারবো আমি

পরদিন ভোরে আমরা পৌছুলাম। অনেকটা জায়গা জুড়ে ওদের গ্রাম। বাঁশের কুটির, দেয়ালে মাটির আস্তর।

সবাই ব্যস্ত—রোদে চামড়া ওক-ফল শুকোচ্ছে, অনেকে বন থেকে লতা-পাতা কেটে আনছে। খাদ্যাভাব আছে বলে মনে হলো না। পোটাকা জানালো বছরে তিনটে ফসল ঘরে তোলে ওরা

কয়েকজন যুদ্ধাহতকে দেখালো সে অধিকাংশই স্প্যানিশদের সঙ্গে লড়াইতে জখম হয়েছে। ওদের উত্তরাভিমুখী যাত্রা বন্ধ করতে

চেয়েছিল এরা।

ব্যবসার ব্যাপারে ওদের খুব আগ্রহ, কিন্তু আমরা সাবধানতা অবলম্বন করলাম। জানালাম জাহাজ না আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হবে, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে বেশি কিছু নেই। খুব হিশেব করে দু-একটা জিনিস দেখালাম। পুঁতি বা ছিটকাপড়ের চেয়ে সুঁচ, ছুরি বা কুঠারের প্রতি ওদের ঝোঁক লক্ষ্য করে আমি বিস্মিত হলাম। প্রকৃতির অকৃপণ দান সত্ত্বেও ওরা যে এতটা পরিশ্রমী জাত আগে বুঝিনি।

প্রথম দিনে সামান্য বেচাকেনা হলো। খাওয়ার সময় আমাদের ক্ষুদ্র ভাণ্ডার থেকে যোগ করলাম কিছু। পোটাকা নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলো, স্প্যানিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইংরেজদের সে কীভাবে সাহায্য করেছে তারই একটা ফিরিস্তি শোনালো। ওই বক্তৃতা, সন্দেহ নেই, সে আগেও বহুবার দিয়েছে, কিন্তু তাসত্ত্বেও ওর সঙ্গীরা ঘনঘন হাততালি দিয়ে উৎসাহ যোগালো।

আমাদের জায়গা-জমির ব্যাপারে আলাপ হলো, গাছের ডাল দিয়ে মাটিতে নকশা এঁকে বিভিন্ন রুট দেখালো পোটাকা।

একটার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করলো। 'ওয়ারিঅরস পাথ,' ওটার নাম জানালো। পশ্চিম দিগন্ত দেখালো, তারপর ঢেউ-খেলানো রেখা টেনে একটা পার্বত্যাঞ্চলের বর্ণনা দিলো। পাহাড়ের নিচের দিকে একটা ফাঁকা জায়গা দেখিয়ে বললো, 'এখানে।'

'এর পরে কিছু নেই?'

'আছে। প্রচুর শিকার মেলে, তবে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ খুব বেশি। বিভিন্ন গোত্রের লোক আসে, আবার চলে যায়। চমৎকার জায়গা, কিন্তু বিপজ্জনক।'

'একদিন,' পোটাকাকে বললাম, 'আমি যাবো ওই রাস্তায়।'

ভ্রূ কুঁচকে আমার পানে তাকালো সে। 'অনেক দূর, পথে বিপদ আছে।'

'পাহাড়ে শিকার কেমন?'

'ভালো।'

আরো দুদিন পণ্য বিনিময় করলাম আমরা। প্রতিবারে আমাদের মজুত থেকে অল্প অল্প করে নিয়ে আসছি। আমাদের ফারের পরিমাণ বাড়ছে দেখে রুফিসকো পর্যন্ত উৎসাহ বোধ করছে এখন। চতুর্থ দিন সব ফুরিয়ে গেলে ডিঙিতে ফার চাপিয়ে ফেরার আয়োজন করলাম।

'আরো মাল আনতে যাচ্ছি,' আমি বললাম। 'আবার আসবো।'

'খুনেদের এলাকা,' ভাটির দিকে নির্দেশ করলো পোটাকা। 'রাতে যেও।'

পুরো গ্রাম বিদায় জানাতে ভেঙে পড়লো ঘাটে। আমাদের ডিঙিটা যখন বাঁক ঘুরে ওদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে এলো, ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়লো রুফিসকো। বললো, 'তোমার কথাই ঠিক। তবে পরের যাত্রায় কী হবে বলা যায় না।'

'আমাদের লাভ হয়েছে,' শান্ত গলায় আমি বললাম। 'ফারগুলোও উৎকৃষ্ট, কিন্তু এখানেই থেমে গেলে চলবে না।'

'হ্যাঁ,' সায় দিলো রুফিসকো, 'চমৎকার ফার। রাশিয়ান ছাড়া এ-রকম জিনিস আর দেখিনি আমি। কিন্তু তোমার বাজার কোথায়। আমাদের সামনে বিরাট নদী, তারপর বিশাল সমুদ্র। এবং সেখানে হয়তো লিনেকার ওত পেতে বসে আছে।'

'তোমার তাই ধারণা?'

'আলবত। ও হাত গুটিয়ে বসে থাকবে ভেবেছো? প্রথমেই ডাঙায়

গিয়ে ইনডিয়ানদের জিজ্ঞেস করবে আমাদের দেখেছে কি না, তারপর নদীর দিকে নজর রাখবে। কটা নদী এখানে আছে বলো? তিনটে? বড়জোর চারটে?

'আমরা তাড়াতাড়ি না ফিরলে ধরে নেবে মরে গেছি। আর ফিরলে মরার ব্যবস্থা পাকাপাকি করবে। ওটা তেমন কোনো সমস্যা নয়, তাই না?

'তুমি বলবে, "এই বিশাল দেশে আমাদের খুঁজে পাবে কীভাবে?" কিন্তু আমার মতে এটা খুব সহজ আমরা ছাড়া আর কোন শেতাঙ্গ নৌকোয় আছে, তাও আবার পাল-তোলা ডিঙিতে? ফলে আমাদের সে ঠিকই খুঁজে বের করবে।'

'তুমি হতাশাবাদী,' অনুযোগ করলাম, কিন্তু আমার আত্মপ্রসাদ ভাব তখন অনেকটা মিইয়ে গেছে। ওর কথায় যুক্তি আছে।

'আমরা ডেরায় ফিরবো রাতে,' বললাম। 'ফার রেখে আরো কিছু মাল নিয়ে চলে আসবো।'

'কিন্তু পোটাকার গ্রামে আর নয়,' সাকিম বললো। 'ওদের সেরা ফারগুলো নিয়ে এসেছি আমরা।'

এই আরেকটা বিষয়, যেটা আগে ভাবিনি আমি। এখন নতুন করে প্ল্যান আঁটতে হবে।

স্রোতের টানে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি আমরা, ইনো নদীর সঙ্কীর্ণ এলাকা পেরিয়ে বড় নদীতে পড়লাম। কাউকে দেখতে পেলাম না।

দুপুর নাগাদ একটা ছোট দ্বীপের গায়ে ডিঙি ভিড়িয়ে আহারপর্ব সেরে নিলাম। ডাঙায় নেমে আঙুর সংগ্রহ করলাম, পানি খেলাম একটা ক্ষুদ্র ঝরনা থেকে, তারপর দিনের বাকি সময়টা ওখানেই বসে থেকে কাটিয়ে দিলাম। যখন রাত নামলো পুরোপুরি, আবার ভাটিতে

রওনা হলাম। মাঝরাতেরও অনেক পরে গুহাটা আবছাভাবে চোখে পড়লো।

নীরব নিথর পরিবেশ। খাঁড়িতে ঢুকে এক মহূর্ত চুপ করে বসে রইলাম। ডিঙির গায়ে ছলাৎ ছলাৎ বাড়ি খাচ্ছে ঢেউ, আর কোনো শব্দ নেই।

ভোরে ফারগুলো নিয়ে গেলাম গুহায়, তারপর প্রথমে যতটা নিয়েছিলাম ঠিক ততখানি পণ্য ডিঙিতে বোঝাই করে অন্য কাজে হাত দিলাম। আমি তীর-ধনুক বানাতে বসলাম, ওরা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করতে লাগলো।

তিনদিন কাটলো এইভাবে। রোজ কাজের ফাঁকে ফাঁকে পালা করে গাছের মগডালে উঠে পাহারা দিচ্ছি আমরা। কিন্তু জলি জ্যাক বা আর কোনো জাহাজ দেখতে পাইনি। চতুর্থ দিন আমি তীর দিয়ে একটা বড় হরিণ শিকার করলাম। হরিণটা কেটে-কুটে মাংস শুকোতে দিলাম। পঞ্চম দিন আরেকটা মারলাম, এটা একটু ছোট আর কম-বয়েসী।

পঞ্চম রাতে, আঁধার নামার বেশ পরে, আবার উজানে যাত্রা করলাম। এ-বার দুরে গেলাম না, পোটাকার গ্রামে যাবার পথে হাতের বাঁয়ে নদীর যে-শাখাটা চোখে পড়েছিল সে-দিকে রওনা হলাম। কিছু দূর এগোনোর পর চাঁদের আলোয় একটা গ্রাম চোখে পড়লো। কূলের অদুরে এমনভাবে নোঙর ফেললাম যাতে আদিবাসীরা যুদ্ধের সাজে বেরিয়ে এলে দ্রুত কেটে পড়তে পারি।

তারপর রুফিসকোকে পাহারায় রেখে আমি আর সাকিম ঘুমিয়ে পড়লাম। শেষরাত নাগাদ ওকে অব্যাহতি দিলাম আমরা। সকালে আমাদের দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীরা হইচই জুড়ে দিলো। একটু বাদে

জনাকয়েক যোদ্ধা এগিয়ে এলো তীরের দিকে। আগেই একটা বড়শি বানিয়ে রেখেছিলাম আমি, ওদের আসতে দেখে বড়শিটা পানিতে নামিয়ে দিলাম।

তীরে এসে চেঁচিয়ে আমাদের ডাকলো ওরা। হাতের ইশারায় আমি বড়শিটা দেখালাম। কিছুক্ষণ পর সুতোয় টান পড়তে হ্যাঁচকা টান মারলাম, প্রমাণ সাইজের একটা মাছ উঠে এলো।

মাছটা উঁচু করে ধরে ভুঁড়িতে হাত বুলালাম, হেসে উঠলো ইনডিয়ানরা। হাত নেড়ে আমি ডাঙায় ওঠার অনুমতি চাইলাম ওদের কাছে।

ওরা ইশারায় ডাকলো, আমি নোঙর তুলে নিলাম, স্রোতের টানে ডিঙিটাকে তীরের গায়ে ভেড়ার সুযোগ দিলাম, তবে সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখলাম চড়ায় যেন আটকে না যায়। আবার নামিয়ে দিলাম নোঙরটা, তারপর দুই বন্ধুকে কাভার দিতে বলে ডাঙায় গেলাম।

আমার দৃষ্টি দ্রুত ঘুরে এলো ওদের ওপর। কারো হাতেই মারাত্মক অস্ত্র নেই, তবে ছুরি সবার কোমরেই আছে—অধিকাংশই পাথরের। মাত্র একটা ইস্পাতের ছুরি দেখলাম, তাও পুরনো এবং মরচে-ধরা।

খানিক বাদে আমার সঙ্গীরাও যোগ দিলো এসে। পোটাকার গ্রামের মতো এটা তত বর্ধিষ্ণু না হলেও স্বচ্ছল এবং বন্ধুবৎসল। ওদের সঙ্গে একসাথে বসে আহার করলাম, সাঙ্কেতিক ভাষায় ট্রেইল সম্পর্কে আলাপ হলো, তারপর আমাদের পসরা সাজিয়ে বসলাম।

অসংখ্য নরমুণ্ড চোখে পড়লো, কয়েকটা হালের। দূরউত্তরে ওদের ওঅর পার্টি গিয়েছিল, ওরা জানালো, সম্প্রতি ফিরে এসেছে। একজন ইনডিয়ান, নাম নিকোনা, এক-আধটু ইংরেজি জানে। শব্দ আর

সঙ্কেতের মিশেলে আলাপ করলাম ওর সঙ্গে। লোকটা চালাক-চতুর, অল্পতেই বুঝতে পারে। আমরা কীভাবে এসেছি জানতে চাইলো, জাহাজটার নকশা এঁকে দেখালাম আমি।

দ্রুত ওপর-নিচ মাথা দোলালো সে ; পুবে, সাগরের পানে ইশারা করলো। দুদিন আগে একটা নদীর মোহানায় ও একটা পিনিস দেখতে পেয়েছে। পিনিসটা দক্ষিণ তীরের কাছাকাছি বাঁকে লুকোনো ছিলো।

'সাকিম,' শান্ত গলায় বললাম আমি—ইনডিয়ানরা যাতে টের না পায় ওদের ভাঁওতা দিয়েছি সে-ব্যাপারে সতর্ক রইলাম—'এ জ্যাককে দেখেছে।'

'আমাদের জন্যে ওত পেতে আছে,' তিক্ত সুরে বললো রুফিসকো।

বেচাকেনা জমে উঠলো ধীরে ধীরে। কিন্তু আমি একটা হানটিং নাইফ বের করতে একজন খপ করে তুলে নিলো ওটা। লোকটার পানে তাকালাম আমি। বিশালদেহী, চৌকো মুখ। গালে একটা কাটা দাগ। চোখে বন্ধুত্বের ছাপ নেই। 'বিক্রি বন্ধ করো,' বললো সে। 'মাগনা দিতে হবে।'

'কিনতে হবে,' শান্তভাবে জবাব দিলাম, সরাসরি চেয়ে রইলাম ওর চোখের দিকে।

ঘোঁত করে শব্দ করলো সে। 'না,' আবার বললো, 'আমি এমনিই নিলাম।'

বাকি ইনডিয়ানরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনতে লাগলো।

'কিনতে হবে,' দৃঢ় সুরে বললাম আমি।

ছুরিটা কোমরে গুঁজতে গেল সে, ওর কবজি চেপে ধরলাম আমি। 'কিনতে হবে,' শান্ত গলায় বললাম, আমার মুঠি চেপে বসলো

আরো।

হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো সে, পারলো না। বিস্ময় অবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠলো ওর চোখে। শক্তি প্রয়োগ করলো, এবারেও ব্যর্থ হলো।

ক্রোধে সমস্ত রক্ত এসে জমা হলো ওর মুখে, কিন্তু হাত নাড়তে পারলো না। উরুর সাহায্যে নিলো, আমি অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'কিনবে?' শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ,' গোমড়া মুখে বললো সে।

দশ

আঁধারের চাদর যেন গোটা প্রকৃতিকে মুড়ে রেখেছে। মসৃণভাবে জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে ডিঙি, সাকিম দাঁড়ে বসেছে।

পাল নামিয়ে রেখেছি, এই অন্ধকারে শাদা রং বহুদূর থেকে চোখে পড়বে। ফারে ফারে আমাদের ডিঙি ভরে উঠেছে, চমৎকার জিনিস, তবে প্রথমবারের মতো অতটা নয়।

লিনেকার খোঁজ পেলে কপালে কী ঘটবে সে-ব্যাপারে আমাদের কারো মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই, তাই খুব সন্তর্পণে ঘাঁটিতে ফিরছি।

গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জড়সড় হয়ে বসলাম আমরা। কূল এসে পড়েছে, আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে গুহা। দাঁড় নামিয়ে পানির গভীরতা মাপলাম।

ভূতের মতো নিঃসাড়ে তীরে পৌঁছে ডিঙি তুলে দিলাম বালুতে। সাকিম ভালোভাবে মাটিতে আটকে দিলো ওটা। ছট্‌রা বন্দুক নিয়ে ডাঙায় পা রাখলাম আমি।

থমথম করছে চারদিক, কেবল জলের ওপর টুপটাপ বৃষ্টি পড়ছে। 'পাহারা দাও,' ফিসফিস করে বলে অন্ধকারে এগিয়ে গেলাম আমি।

গুহামুখের সামনে কেউ নেই, তবু নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। একটা কিছু গোলমাল আছে বলে সন্দেহ হলো, বড় রকমের গোলমাল। 'ডিঙিটা আবার জলে ভাসাও, সাকিম,' ফিরে গিয়ে বললাম চাপা স্বরে। 'পালাতে হ'তে পারে।'

'কোনো গোলমাল?'

'না...কিন্তু আমার মন বলছে।'

'আমারও।'

বুঝতে পারছি না আমাদের গোপন ডেরার সন্ধান ওরা পেয়েছে কি না। তবে এটুকু বিশ্বাস আছে গুহাটা খুঁজে পেলেও ফারগুলো ওদের চোখে পড়বে না।

'আমার ঘুম দরকার,' বিরক্তির সুরে বললো রুফিসকো। 'খিদেও পেয়েছে ভীষণ।'

'ব্যস্ত হয়ো না,' আমি বললাম, 'নিরাপত্তার বিষয়টা বেশি জরুরি।'

তীর ঘেঁষে বৃত্তাকারে ঘুরে গুহার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। হঠাৎ একটা অবাঞ্ছিত শব্দ কানে আসতে থমকে দাঁড়ালাম।

মট করে একটা ডাল ভাঙার আওয়াজ হলো, তারপর আরেকটা।

চকমকি পাথর ঠোকা শব্দ। আগুন ধরাচ্ছে কেউ। ঘুরে দাঁড়ালাম।

রুফিসকো। ডাঙায় নেমে ইতিমধ্যেই আগুন ধরিয়ে ফেলেছে।

তিক্ত সুরে মনে মনে অভিসম্পাত দিয়ে সবে এক পা এগিয়েছি— আচমকা মানুষের পদশব্দে রাতের নৈঃশব্দ্য খান খান হয়ে গেল।

আগুন লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো ওরা, বোধ হয় আর কিছু দেখতেও পায়নি।

তারপর বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে গমগম করে উঠলো লিনেকারের গলা: 'জাহান্নামে যা, হতভাগার দল। মোটে একজন। কে বলেছে গুলি ছুঁড়তে? আর দুটো গেল কোথায়?'

ঘুরে, হামাগুড়ি দিয়ে কূলের দিকে রওনা হলাম। মনে মনে প্রার্থনা করছি ঈশ্বরের কাছে, সাকিম যেন ডিঙি নিয়ে ধারেকাছে কোথাও থাকে। সন্তর্পণে অন্ধকার জলে নামলাম, আমার গোড়ালি···হাঁটু ডুবে গেল···আচমকা অসীম অন্ধকার থেকে একটা হাত এসে চেপে ধরলো আমাকে। সাকিম।

ওর হাতে বন্দুক আর তলোয়ারটা দিয়ে নীরবে ডিঙিতে উঠে বসলাম। রুফিসকো হয় মারা গেছে নয়তো বন্দী হয়েছে। এই মুহূর্তে আমরা সাহায্য করতে পারছি না ওকে। নিজেদের চলাফেরার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে আগে।

সাকিম একটুও সময় নষ্ট করলো না। দাঁড় ঠেলে আরো গভীর অন্ধকারে ঢুকে গেল। ডাঙা থেকে ক্রুদ্ধ চেঁচামেচির শব্দ ভেসে আসছে। লিনেকারের গলা স্পষ্ট শুনতে পেলাম। 'ওরা কোথায়? বল, নইলে তোকে জবাই করবো।'

'নেই,' ইচ্ছে করেই চেঁচিয়ে বললো রুফিসকো, আমরা যাতে শুনতে পাই। 'ফার আনতে উজানে গেছে। আমাকে রেখে গেছে

খাবার জোগাড়ের জন্যে...'

তারপর মিলিয়ে গেল কণ্ঠস্বর।

ভোর হয়ে এলো প্রায়। টিলার পাশ দিয়ে ঘুরে নদীতে পড়ার সময় ওরা দেখে ফেলতে পারে, তবু ঝুঁকিটা নিতে হবে। কীভাবে আমাদের হদিস পেলো—বোটে চেপে এসেছে না বনের ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে—জানি না।

টিলার বাঁক ঘুরে নদীর মুখে এসে পড়লাম। আকাশ ফরসা হয়ে এসেছে, তবু সাকিম সাহসে ভর করে সজোরে দাঁড় ঠেলে দিলো জলের গভীরে। দ্রুত আগে বাড়লো আমাদের ডিঙি। হঠাৎ ডাঙা থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো, তারপর গুলি ছুঁড়লো কেউ। কিন্তু এখন আর আহত হবার ভয় নেই, নাগালের বাইরে চলে এসেছি, স্রোতের টানে এগিয়ে যাচ্ছি তরতর করে।

রুফিসকোকে পরিত্যাগ করার কোনো পরিকল্পনা আমার নেই। কিন্তু আগে ফারগুলো কোথাও রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তখন হালকা ডিঙি নিয়ে অবাধে ঘোরাফেরা করতে পারবো।

আরেকটু সকাল হতে পাল খাটিয়ে দিলাম, নদীর শেষ-প্রান্ত ঘেঁষে যাচ্ছি এখন। হাতে সময় কম, একটা ছোট দ্বীপের দিকে এগিয়ে গেলাম। দ্বীপটা নিচু, লুকোনোর মতো তেমন কোনো জায়গা চোখে পড়ছে না, তবে কিছু গাছগাছালি আর উইলো ঝোপ রয়েছে।

'এখানে আমাদের খোঁজার কথা ভাববে না ওরা,' যেন আমার মনের কথাটা টের পেয়েই বললো সাকিম।

দ্বীপের এক প্রান্ত ঘুরে দেখতে গেল সে, আরেক মাথায় গেলাম আমি। একটু বাদে নিচু স্বরে আমাকে ডাকলো সে।

একটা উইলো ঝোপের ধারে দাঁড়িয়েছিল সাকিম, ওর পেছন

পেছন ভেতরে ঢুকে থ হয়ে গেলাম আমি।

একটা জাহাজের বো এবং ভাঙাচোরা খোল পড়ে আছে, বেশির ভাগ চলে গেছে বালুর নিচে। কতকাল ধরে এখানে পড়ে আছে ওটা কেউ বলতে পারবে না, তবে পুরু ওকের কাঠামো আজো অটুট রয়েছে। ভেতরে ঢুকতেই প্রথমে ক্যাপটেনের কোয়ার্টার পড়লো। এটাও অক্ষত রয়েছে। জাহাজটা কাত, তাই অর্ধেকটা পরিপূর্ণ হয়ে আছে বালুতে। ক্যাপটেনের ঘরটাকেই আপাতত ফার গুদাম হিশেবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিলাম।

গাঁটগুলো ভেতরে নিয়ে গিয়ে উইলোর ডাল আর নলখাগড়া দিয়ে ঢেকে দিলাম। তারপর ডিঙি নিয়ে ফিরে গেলাম আগের জায়গায়। মেঘাচ্ছন্ন আলোয় মৃত্যুপুরীর মতো খাঁখাঁ করছে বেলাভূমি—ওরা চলে গেছে। অসংখ্য পদচিহ্ন আর দু-এক ফোঁটা রক্তের দাগ ফুটে আছে বালুতে।

'জাহাজে ফিরে গেছে,' আমি বললাম, 'পিছু নিতে হবে।'

'ওকে ছিনিয়ে আনবে?'

'বেঁচে থাকলে অবশ্যই আনবো। ও আমাদেরই একজন।'

'এটা কিন্তু একটা টোপ,' সাকিম জবাব দিলো, 'আসলে তোমাকে ধরতে চায় ওরা।'

'তা হোক। তুমি যাবে আমার সাথে?'

'যাবো।'

আজ যদি সূর্য উঠেও থাকে তো মুখ লুকিয়ে আছে, আনত মেঘে ঢেকে আছে আকাশ, গাছের পাতা থেকে টপটপ করে বৃষ্টির ফোঁটা ঝরে পড়ছে।

ওরা যেটা ব্যবহার করেছে সেই সরু ট্রেইলটা খুঁজে পেলাম

আমরা, তবে ওটাতে না গিয়ে প্রায় সমান্তরাল আরেকটা পথ বেছে নিলাম।

তলোয়ার, ছোরা আর তীর-ধনুক রয়েছে আমার সাথে, ছট্‌রা বন্দুকটা ডিঙিতে রেখে এসেছি। সাকিম দুটো পিস্তলে টোটা পুরে কোমরে গুঁজে রাখলো। ওর বল্লম আর সিমিট্যারখানাও নিলো।

ভেজা পিচ্ছিল রাস্তা, নীরবে এগিয়ে গেলাম আমরা, মাঝে-মধ্যে থেমে কান পাতলাম যদি কোনো শব্দ শোনা যায়, কিছুই শুনতে পেলাম না। মাইলখানেক যাবার পর চড়াই শুরু হলো। দুঘণ্টার মাথায় একটা ছোট পাহাড়ের চুড়োয় পৌঁছুলাম। পুব এবং দক্ষিণের গোটা এলাকা ভেসে উঠলো আমাদের চোখের সামনে। মাত্র আধ মাইল দূরে জলি জ্যাক দাঁড়িয়ে আছে।

আমাদের সঙ্গীকে উদ্ধারের ব্যাপারে এখনো কোনো প্ল্যান করিনি আমি, তবে যেভাবেই হোক কাজটা যে করতে হবে সে-বিষয়ে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই মনে। এবং সেটা করতে হবে বুদ্ধি খেলিয়ে।

ট্রেইলে পাহারা থাকার আশঙ্কা আছে বলে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে নামতে শুরু করলাম আমরা। কিছুক্ষণ পর জলি জ্যাক থেকে দেড়শো ফুট দূরে একটা উঁচু কাঠের গাদার সামনে গিয়ে থামলাম। ওখানে কেউ দেখতে পাবে না আমাদের।

রুফিসকোকে দেখামাত্র হত্যা না করার পেছনে লিনেকারের উদ্দেশ্য একটাই: ওর কাছ থেকে আমাদের গোপন ডেরার হদিস জানতে চায়। এই যন্ত্রণা থেকে ওকে রক্ষা করারও একটাই উপায়: উদ্ধার করতে হবে।

'এবার?' ফিসফিস করে জানতে চাইলো সাকিম, জাহাজের পানে চেয়ে আছে সে।

মইয়ের সামনে আড়ধনু হাতে পায়চারী করছে একটা লোক। ডাঙায় তাড়াহুড়ো করে কয়েকটা তাঁবু খাটানো হয়েছে। গনগনে আগুন জ্বলছে একটা।

খাড়া পাড়ের গায়ে নোঙর ফেলেছে জলি জ্যাক। বো এবং স্টার্ন থেকে দুটো কাছি টেনে এনে একটা ওক গাছের সাথে বেঁধে দেয়া হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, লিনেকার বা জাহাজের অন্য কেউ এই জায়গা আগে থেকেই চিনতো।

'কূলের গায়ে ভিড়েছে,' মন্তব্য করলাম আমি।

কাঁধ ঝাঁকালো সাকিম। 'দেশে আমরা চড়ায় তুলে দেই, জোয়ারের জল সমুদ্রে টেনে নিয়ে যায় পরে।'

'কারেনট আছে,' জলের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত সুরে বললাম আমি। 'ওদের পশ্চিমে কোনোখান থেকে আরেকটা নদী এসে পড়েছে।'

'ওই যে। ওকে জাহাজে তোলেনি এখনো,' সহসা সাকিম বললো। দেখালো হাত দিয়ে। 'এইমাত্র তাঁবুতে নিয়ে গেল। দুজন পাহারা দিচ্ছে।'

আমিও দেখতে পাচ্ছি পাহারাদারদের। এখন একটা ডাইভারসন সৃষ্টি করতে পারলে···

লোকগুলোর চেহারাই বলে দিচ্ছে ওদের প্রাণে দয়ামায়ার স্থান নেই। রুফিসকোকে ওরা মারধোর করুক এ আমি চাই না। ও নেহাত গোবেচারা মানুষ—এ-রকম গুণ্ডা-বদমাশের হাতে লাঞ্ছিত হবার লায়েক নয়।

বেছে বেছে এখানেই ওরা ঘাঁটি করেছে বলে দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার। জংলীদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই আমি। কিন্তু

জলি জ্যাকের লোভী নিষ্ঠুর মাল্লারা থাকলে সেটা সম্ভব নয়।

'একটা উপায় আছে, সাকিম,' বললাম। 'আইডিয়াটা মাত্র আমার মাথায় এলো।'

তাকালো সে। 'কাজ হয় এমন কিছু হতে হবে,' বললো সাকিম, 'হাতে বেশি সময় নেই, আর ওরা সংখ্যায়ও মেলা।'

পেছন ফিরে বনের ভেতর ঢুকে গেলাম আমি, অনেকটা ঘুরপথে তীরের দিকে এগিয়ে গেলাম। বাবা সর্বদা বলতেন, জেতার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে আক্রমণ করা। প্রতিপক্ষ সংখ্যায় যতই বেশি হোক, সফল আক্রমণ রচনার উপায় সব সময়ই থাকে।

একটু খুঁজতেই যা চাইছিলাম পেয়ে গেলাম। যে-গাছের সাথে আপস্ট্রিম লাইন বাঁধা হয়েছে তার সামনে হাজির হলাম। 'তীব্র স্রোত,' আমি বললাম।

এ-বার আমার মতলবটা যেন বুঝতে পারলো সাকিম, ওর কালো-ছুঁচোলো দাড়ির ফাঁক দিয়ে সবগুলো দাঁত উঁকি দিলো। 'হ্যাঁ, তীব্র স্রোত,' সায় দিলো সে। 'এবং এই বাঁধনটা কেটে দিতে পারলে…'

বুকে হেঁটে আমি আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, ওখানে পাহারায় কেউ নেই। সত্যি বলতে কি, আমাদের চেয়ে জাহাজের কাছে-পিঠে আর কেউ নেই, এবং দড়িটাও যথেষ্ট লম্বা। গুঁড়ির সাথে পেঁচিয়ে বেঁধে লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে ভালো করে।

'বড় শেকড়গুলো কাজে আসবে,' বললাম আমি, 'কিন্তু তার আগে কাদা দিয়ে জায়গাটা ঘিরে দিতে হবে।'

'কাদা?'

'বাঁধন কাটবো না,' ব্যাখ্যা করলাম, 'রুফিসকোকে উদ্ধারের জন্যে আমাদের দুজনকেই যেতে হবে। সুতরাং এটা ছেঁড়ার সময় ওখানে

উপস্থিত থাকতে হবে, এখানে নয়। দড়ির ঠিক নিচে ছোট করে আগুন জ্বালাবো—কাদা, শেকড় আর লতাপাতার আড়ালে ঢাকা থাকবে। তারপর যেই দড়ি ছিঁড়বে, আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো।'

একমুহূর্ত চিন্তা করে ঘাড় কাত করে সায় দিলো সাকিম। 'ইন-শাল্লাহ্।'

সাবধানে আগুন ধরিয়ে কয়েকটা ছোট ডাল গুঁজে দিলাম। পুড়তে শুরু করলো মোটা কাছি স্পর্শ করলো শিখা। আরো কটা ডাল ফেলে দিয়ে আমরা দ্রুত ফিরে গেলাম আগের জায়গায়।

এখন কেবল আশায় বুক বেঁধে প্রতীক্ষা। আগুন যদি নিভে না যায় কিংবা কেউ দেখে না ফেলে, কাছিটা ছিঁড়তে বাধ্য স্রোতের টানে জাহাজ উলটো মুখে ঘুরে যাবে। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়বে নিজেদের জাহাজ বাঁচাতে। তখন···

আমরা অপেক্ষা করছি···স্নায়ুর চাপ বাড়ছে। কিছুই ঘটলো না। যে-তাঁবুতে রুফিসকোকে আটকে রাখা হয়েছে, তার দরজায় সেই আগের দুজনই পাহারা দিচ্ছে। অন্যরা চুলোর আগুনের পাশে ভিড় জমিয়েছে। জ্যাতে তীর পরালাম আমি, তাঁবুর সামনে-দাঁড়ানো যে-লোকটা আমার সব চেয়ে কাছে রয়েছে তার দিকে তাকালাম।

সব কিছু শান্ত। জাহাজটা স্থির হয়ে আছে, তবে সামান্য টান পড়েছে কাছিতে। আগুনটা নিভে গেল নাকি? কেউ দেখে ফেলেনি তো?

সহসা একটা তীক্ষ্ণ শব্দ করে ছিঁড়ে গেল কাছিটা, চোখের পলকে জাহাজের স্টার্ন ঘুরে গেল স্রোতের দিকে। চিৎকার করে উঠলো কেউ, তারপর চেঁচামেচি, ছুটোছুটি পড়ে গেল ডেকে। বো লক্ষ্য করে ছুটে গেল সবাই, দড়ির মইটা ওখানেই ঝুলছে।

'চলো,' বলেই দ্রুত আগে বাড়লাম আমি, সজাগ দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ। এক পা, দুপা···মোটা পাহারাদারটা ঘুরে দাঁড়ালো, সাঁ করে আমার তীর ছুটে গেল। পাহারাদারের কণ্ঠনালীতে ঢুকে গেল ওটা, মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সে, দুহাতে তীরটা ছাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলো।

ওদিকে কূলের আশপাশে হুলস্থুল বেধে গেছে।

দ্বিতীয় গার্ডটা পালাতে চেষ্টা করলো, একহাতে ওর গলা পেঁচিয়ে ধরে আরেক হাতে পাঁজরায় ছুরি মারলো সাকিম। সুট করে তাঁবুতে ঢুকে পড়লাম আমি।

বাঁধন ছেঁড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে রুফিসকো, তলোয়ার দিয়ে কেটে দিলাম আমি। 'পা মালিশ করে নাও,' বললাম, 'আমাদের ঝেড়ে দৌড়ুতে হবে।'

'পারবো,' জেদী গলায় বললো রুফিসকো। বাইরে এসে তলোয়ারটা খাপে পুরে আবার ধনুক তুলে নিলাম আমি, ছিলায় তীর পরিয়ে পিছু হটলাম।

আমার চোখজোড়া লিনেকারকে খুঁজে ফিরছে ওর বুকে একটা তীর বেঁধাতে পারলে প্রাণটা জুড়োতো।

মাত্র একটা তীর।

দেখতে পেলাম ওকে, কিন্তু ভিড়ের মাঝে রয়েছে বলে লক্ষ্য স্থির করা সম্ভব হলো না। 'আরেক সময়, ক্যাপটেন,' আপনমনে বললাম, 'আরেক সময়।'

ঘুরে বনে ঢুকে পড়লাম আমি, একটু বাদে ধরে ফেললাম বন্ধুদের

আমাদের আক্রমণে চমক ছিলো, তবে সৌভাগ্যেরও হাত রয়েছে এতে। এটা মোটেও পছন্দ হলো না আমার। অচিরেই আমাদের

ওপর বড় রকমের কোনো আঘাত আসতে যাচ্ছে, হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম।

এগারো

গাছের ছায়ায় চুপচাপ শুয়ে আছি আমি, ভাবছি। ডিঙিতে পৌঁছে প্রথমেই কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়ে তারপর উঠে রান্না সেরে আবার শুয়ে পড়েছি। খানিক আগে আমার ঘুম ভেঙেছে, ওরা এখনো ওঠেনি।

ভীষণ একা বোধ করছি, হাওড়ের কথা মনে পড়ছে, বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে আলো-হাতে একটি মেয়ের মুখচ্ছবি। ওকে মনে পড়ার মতো কোনো সঙ্গত কারণ আমার নেই, তবে পুরুষমাত্রেই মেয়ের কথা ভাবে—আমি ভাবছি ওর কথা।

ঘর-সংসারের প্রতি আমাদের টান বরাবর, এবং আমার, যদিও বাব ছাড়া তিনকূলে কেউ ছিলো না, ওই বোধটি খুব প্রবল। এখন আমাদের কাছে ফার রয়েছে, যার অর্ধেক আমার। পরিমাণ হিশেবে মন্দ নয়, তবে অপর্যাপ্ত। আমাদের এখন উপকূলে গিয়ে টমাসের জাহাজের সন্ধান করা দরকার। এতদিনে ওটা বোধ হয় এসে পড়েছে।

এখন এই ফার দিয়ে পণ্য সংগ্রহ করতে পারলে পরের যাত্রায় হয়তো আরো বেশি লাভ করতে পারবো।

বড় দেখে এক টুকরো হরিণের মাংস ঝলসাতে শুরু করলাম আমি।

'তোমাকে ধন্যবাদ জানানো হয়নি।' রুফিসকোর গলা শুনে পেছন ফিরে দেখলাম ও উঠে বসেছে।

'এ আর এমন কী?' আগুনটা উসকে দিলাম। 'আমার বেলায় তুমিও এগিয়ে আসতে।'

'কী জানি?'

'আমার জায়গায় থাকলে,' বললাম, 'আসতেই হতো।'

'তোমার জায়গায়?'

'আমি নিয়ে এসেছি তোমাদের। এর একটা দায়ভার আছে না। বুঝতে পারছো, নিশ্চয়ই?'

হাসলো সে। 'আমি নেতৃত্ব এড়িয়ে চলতে পছন্দ করি। দায়-দায়িত্ব নিতে ইচ্ছে করে না।'

ছুরি দিয়ে এক ফালি মাংস কেটে নিলাম, ছ্যাঁকা লাগলো আঙুলে 'তুমি আর সাকিম যখন আসতে রাজি হলে, স্বাভাবিকভাবেই তোমাদের নিরাপত্তার ভার আমার কাঁধে এসে বর্তালো। আমি আর ঝাড়া হাত-পা রইলাম না। একেবারে হৃদয়হীন না হলে আমার বিশ্বাস, নেতৃত্ব গ্রহণ করে নানাভাবে উপকৃত হওয়া যায়।'

'আমার আপত্তি নেই, তুমি স্বচ্ছন্দে নিতে পারো।' একখণ্ড মাংস কাঠিতে গেঁথে আগুনে ধরলো সে। 'তা এখন কী করবে, ভেবেছো?

'সমুদ্রে যাবো। ঝড়ে ডুবে গিয়ে না থাকলে টাইগার হয়তো এসে পড়েছে অ্যাদ্দিনে। ওর চার্ট দেখেছি আমি, এ-দিকেই আসার কথা।'

'তারপর?'

'ফার দিয়ে আরো মাল নেবো।'

'আমি নেই, বাবা।'

'নেই?'

'লক্ষণ ভালো ঠেকছে না আমার। এই দেশ আমার জন্যে নয়। আমি নেপলস কিংবা ফ্লোরেনস বা রাভেনাতে ফিরে যাবো। কোনো চত্বরে বসে রোদ পোয়াতে পোয়াতে সুন্দরীদের যাওয়া-আসা দেখবো আর পেট পুরে মদ খাবো। না, দোস্ত, আমি বেঘোরে প্রাণটা খোয়াতে চাই না।'

চারপাশের প্রকৃতির প্রতি ইশারা করলো। 'এই বিরান দেশ, অরণ্য, পাহাড়-পর্বত এ-সব আমার ধাতে সইবে না। আমি রাস্তার মানুষ, ভিড় ঠেলে চলতে ভালোবাসি।'

ইতিমধ্যে সাকিমও জেগে গিয়েছে, রুফিসকোর কথায় হাসছে। 'আমারও সেই একই হাল,' বললো সে, 'কিন্তু এর···এর কোনো তুলনা হয় না। এই জঙ্গল পাহাড়-পর্বত···অপূর্ব। এর পরে কী আছে কে বলতে পারে?'

শ্রাগ করলো রুফিসকো। 'আমি বলছি কী আছে—আরো পাহাড়, আরো জঙ্গল। প্রতিটা রাস্তার বাঁকের পরে আরো বাঁক। তোমার ইচ্ছে হয় থাকো; আমি কোনো সরাইখানায় বসে চোলাই খাবো, আর গাঁয়ের মেয়েদের টিটকারী মারবো। হয়তো এ-জন্যে দু-চারটে চড়-চাপড় জুটবে কপালে, কিন্তু আবার অনেকের হাসিও উপহার পাবো।

'অ্যালান, তুমি মনেপ্রাণে ব্যবসায়ী, আর, সাকিম, তুমি কবি। কিন্তু আমি প্রেমিক। এখানে এসে আমার চোখ খুলে গিয়েছে, নিজেকে চিনতে পেরেছি। আমি শেষ বিকেলে সামনে মদের গ্লাস নিয়ে কোথাও বসে থাকবো, আর পায়রাদের উদ্দেশে রুটি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেবো।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। 'বেশ তো, কিন্তু এখনকার মতো আমাদের

খাঁড়িতে ফিরে যাওয়া উচিত।'

পাড়ে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নদীর পানে তাকালাম। ঘোলা পানি মন্থর গতিতে বয়ে যাচ্ছে খাঁড়ির দিকে। একটা বিশাল মরা গাছ ভাসছে, ওরই একটা ডালে বসে পরমানন্দে ডানা ঝাপটাচ্ছে একটা বাদামি রঙের পাখি, বড় মিষ্টি সুরে গান গাইছে।

পাল তুলে রওনা হলাম, জলি জ্যাকের ভয়ে সিঁটিয়ে আছি, তাকিয়ে রয়েছি সামনে মোহানার দিকে। কিছুক্ষণ পরে মূল খাঁড়িতে ঢুকলাম।

দুপুর গড়িয়ে গেল তবু দিগন্তে কোনো পালের দেখা নেই। খণ্ড খণ্ড মেঘ, অসংখ্য গাংচিল ভেসে বেড়াচ্ছে, থেকে থেকে ওদের শাদা ডানায় প্রতিফলিত হয়ে ঝিকিয়ে উঠছে ম্লান সূর্যের আলো। দূরপুবে উপকূল রেখা দেখতে পাবো বলে আশা করেছিলাম, কিন্তু কোনো মাস্তুল বা কালো অবয়ব চোখে পড়লো না—শুধু অবারিত প্রসারিত ধূসর জল আর জল এবং আমাদের পেছনে, ডাঙায়, গাঢ় সবুজ বন।

স্টার্নে গিয়ে আমার চার্টগুলো জরিপ করতে বসলাম। দুটো বিশাল খাঁড়ি রয়েছে এখানে, অনেকগুলো ছোট-বড় নদী এসে মিশেছে এদের জলে। উপকূলীয় দ্বীপগুলো সমুদ্র থেকে আড়াল করে রেখেছে খাঁড়িদুটোকে। আমার বিশ্বাস, সর্বদক্ষিণের দ্বীপটা থেকে আমরা এসেছি। উপকূল হয়ে সমুদ্র থেকে খাঁড়িতে ঢোকার অনেকগুলো পথ রয়েছে, এগুলো এবং আরো কয়েকটা নদী সুন্দরভাবে এঁকে বোঝানো হয়েছে ম্যাপে। নিঃসন্দেহে কোনো লোক এই এলাকাটা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে জরিপ করেছিল।

রাতভর দাঁড় বাইলাম আমরা, মাঝে-মধ্যে হাল ঘুরিয়ে বাতাসের অনুকূলে রইলাম। ভোরে হাওয়া পড়ে গেলে শান্ত সমুদ্রে ঢুকলাম,

উত্তরপশ্চিম দিগন্তে তখন উষার ফিকে আলো ফুটতে শুরু করেছে।

আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে, তবে কোনো জাহাজ নেই। সূর্য ওঠার একটু বাদে পালে সমুদ্রের বাতাস পেয়ে, আশ্রয় নিতে পারবো এমন কোনো খাঁড়ি বা উপসাগরের সন্ধানে, কূলের কাছাকাছি সরে গেলাম আমরা।

খুঁজে পেলাম জায়গাটা, নিচু তীর—জলাভূমি—তবে লুকোনোর মতো আশ্রয় আছে। সাকিম একটা মোটা কাছি ছুঁড়ে ডাঙার একটা গাছের গায়ে পেঁচিয়ে দিলো, তারপর আমরা পাড়ে ভিড়লাম।

ডাঙায় নেমে প্রথমেই আগুন জ্বেলে খাওয়া সারলাম, তারপর আমার বড় ধনুকটার জন্যে তীর বানাতে বসলাম আমি।

কোনো জংলী দেখতে পেলাম না আমরা। মাঝে-মধ্যে কয়েকটা বুনোহাস আকাশে উড়ছে, আমি তীর মেরে একটা শিকার করলাম। খেয়ে ঘুমিয়ে বিশ্রামে পুরো দিনটা কাটিয়ে দিলাম আমরা। দুজন ডাঙায় এবং আরেকজন ডিঙিতে ঘুমুলাম। সন্ধ্যে নাগাদ সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়ে একটা হরিণ চোখে পড়তে ওটা শিকার করলাম আমি।

প্রথমে ছাল ছাড়িয়ে হাড়-মাংস আলাদা করলাম তারপর মাংসটা ধোঁয়ায় শুকিয়ে নিলাম।

মাংস ছাড়া আর সব জিনিস ডিঙিতে তোলা হয়ে গেছে, দড়ি খুলে সাকিম অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।

একটা চিৎকার শুনতে পেলাম আমি···চাপা, আর্তচিৎকার।

ঝট করে ঘুরতেই রুফিসকোকে দেখতে পেলাম। গায়ে চারটে তীর বিঁধেছে, দশ-বারোজন জংলী ছুটে আসছে আমাদের পানে। সাকিম গুলি করলো।

একজন মুখ থুবড়ে পড়লো, কিন্তু অন্যরা ক্ষান্ত হলো না এতে। একটা জংলী আমার মাথা বরাবর কুঠার নামিয়ে আনলো, বাউলি কেটে সরে গিয়ে তলোয়ার ঘোরালাম আমি, কনুই থেকে খসে পড়লো ওর হাত। ও-দিকে সাকিম গাদা বন্দুক ছুঁড়লো।

ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল. দুজন ধুলিশয্যা নিয়েছে, একজনের অবস্থা খুব সঙ্গিন। আমি দৌড়ে গিয়ে রুফিসকোকে টেনে ডিঙিতে নিয়ে এলাম। এক ঝাঁক তীর ধাওয়া করলো আমাদের।

একটা আমার গায়ে সামান্য আঁচড় কাটলো, আরেকটা পরনের কাপড়ে বিঁধলো, কিন্তু জংলীরা আমাদের ধরতে পারলো না। বাতাসে পাল ফুলে উঠেছে, ওদের নাগালের বাইরে চলে এসেছি আমরা।

রুফিসকো চোখ মেলে তাকালো আমার দিকে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, রক্তের গাঁজলা নেমেছে কশ বেয়ে। 'দেরি হয়ে গেছে!' বিড়-বিড় করে বললো। 'রোদ পোয়ানো আর আমার ভাগ্যে হলো না।'

ওকে মিছে আশ্বাসে ভোলানো যাবে না, আমার মতো ও নিজেও জানে যে, ওর ফুসফুসে তীরের জখমদুটো মারাত্মক। আমার হাত চেপে ধরে রইলো সে, হাতটা সরিয়ে নিয়ে ওর আরামের ব্যবস্থা করতে পারলাম না আমি এ-মুহূর্তে এটাই বোধ হয় ওর শেষ-ইচ্ছে।

'আমাকে এমন জায়গায় কবর দিও যেখান থেকে সমুদ্রের ঘ্রাণ নিতে পারবো,' থু-থু করে একদলা রক্ত ফেলে ও বললো।

'তীরগুলো তোমার পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়েছে,' আমি বললাম। 'ওগুলো বরং ঠেলে বের করে দিই, আরাম হবে।'

একটা উরু ভেদ করে অর্ধেক বেরিয়ে এসেছে, গলগল করে রক্ত পড়ছে ক্ষতস্থান থেকে।

'থাকতে দাও। আমার মনে এখন মৃত্যুর ঘণ্টা বাজছে।' আবার থুতু ফেললো সে। 'পৌরুষের সাথে মরতে পারছি, এটাই আমার শান্তি।'

নৌকোর পাটাতনে ও কাত হয়ে পড়ে রইলো, দুচোখ বন্ধ, ঘড়ঘড় করছে গলা, গাঁজলায় মাখামাখি হয়ে আছে ঠোঁট। আমি মুছিয়ে দিলাম।

আবার চোখ মেললো সে, দৃষ্টি অদ্ভুত রকমের শান্ত। 'বাদলা দিন, এমন দিনেই একজন খাঁটি ইটালিয়ানের মরা উচিত।'

'উপকূলীয় দ্বীপে গেলে নিরাপদ জায়গা মিলবে,' বললো সাকিম।

বাঁ হাতে ওর হাত ধরে রইলাম আমি, ডান হাতে রইলো হাল। অনেক দূরের রাস্তা, পথেই কোথাও মারা গেল রুফিসকো···কখন, এবং ঠিক কোন জায়গায় টের পাইনি। কেবল একসময় ওর মুঠি শিথিল হয়ে পড়লো, হাতটা নামিয়ে রাখলাম। সাকিম তাকালো আমার দিকে, কিন্তু কিছু বললো না।

একজন সাথী হারিয়েছে সে, এমন যাকে সহজে হারাতে চায় না মানুষ।

আমরা যখন কূলে পৌছুলাম, পুবের আকাশ অনেকটা অতিক্রম করে গিয়েছে চাঁদ। দীর্ঘ বেলাভূমি, পাড়ে মৃদু সুরে বাড়ি খাচ্ছে খাঁড়ির জল।

ডিঙিটা বেলাভূমিতে টেনে তুললাম, লম্বা দড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে একটা নিচু গাছের সাথে বেঁধে দিলাম। তারপর রুফিসকোর মরদেহ ডাঙায় এনে জোয়ারসীমা থেকে উঁচুতে কবর খুঁড়ে সমাধিস্থ করলাম। এখানে বাতাসের শব্দ, সমুদ্রের নাড়িস্পন্দন অনুভব করতে পারবে সে। ওর স্বদেশের ভূমধ্যসাগর থেকে, আমি ভাবলাম, খুব

একটা তফাত হবে না—এটাও স্থলভাগ-লগ্ন জল, এবং উষ্ণ।

একটা গাছের ডাল পুঁতে চিহ্ন দিয়ে রাখলাম জায়গাটা, কিন্তু সকালে, যখন দিনের আলো ফুটলো, একটা শিলাখণ্ডে নাম খোদাই করে ওখানে বসিয়ে দিলাম। জন্মতারিখ জানি না, মৃত্যুতারিখ লিখলাম। এবং ওর নাম—তবে, সত্যি বলতে কি, মানুষের স্মৃতি তার ফেলে-আসা স্বপ্ন এবং তার কর্মের মাঝে বেঁচে থাকে, কোনো শিলাখণ্ডের গায়ে নয়…

তারপর ডিঙি নিয়ে উত্তরে যাত্রা করলাম। সে-দিন কোনো পাল চোখে পড়লো না আমাদের, এবং তার পরদিন, কিংবা তার পরের দিনও নয়।

উত্তরে যে-খাঁড়িটা রয়েছে তার কূলে এসে আবার স্থলভাগে নামলাম আমরা। নব্বই কদম দূর থেকে তীর দিয়ে আমি একটা হরিণ মারলাম। দুপুরের খাওয়া চুকলে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম বালুর ওপরে।

'এই জায়গা খুব সুন্দর,' বললো সাকিম। হঠাৎ সে উঠে বসলো। 'এখানেই তোমার ঘর বাঁধা উচিত।'

'এখানে?' কথাটা আমার মনেও জেগেছিল, তাই অবাক হলাম না। 'বোধ হয়। আমি সংসার পাততে চাই। একজন মানুষের সব সময়ই কিছু না কিছু গড়া উচিত।'

'ছেলে চাও?'

'ছেলেমেয়ে, দুটোই।'

কনুইতে ভর দিয়ে বসলাম আমি। 'সাকিম, তোমার কী ইচ্ছে?'

'কিচ্ছু না। আমি একসময়, দোস্ত, জ্ঞানপাপী ছিলাম। একজন ডাকসাইটে লোকের মেয়ের সাথে প্রেম ছিলো। কিন্তু যে-দিন ধরা

পড়ে গেলাম, কাউকে কিছু না জানিয়ে কেটে পড়লাম।'

'পরে আর ফিরে যাওনি?'

'মরার জন্যে? তাছাড়া ওই মেয়েটাও জ্ঞানপাপী।'

'মানে?'

'যখন দেখলো আমি নেই, আরেকজনকে বিয়ে করে ফেললো। এখন সে মস্ত ধনী। সমাজে প্রচুর নামডাক আজ আর আমার প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে না, বরং অতীতের কথা ভেবে আমোদ পাবে।'

'তুমি তখন ছাত্র ছিলে?'

'না, শিক্ষকতা করতাম। আমার বাপ-দাদারা ছিলেন আইনজীবী, এবং আমারও তাই হবার কথা ছিলো।'

'তুমি ভাগ্যবান। আমি বাড়িতে পড়াশুনো করেছি, স্কুলে যাবার সৌভাগ্য হয়নি।'

কাঁধ ঝাঁকালো সাকিম। 'কিন্তু তুমি তোমার বাবাকে পেয়েছো, যিনি নিশ্চয়ই জ্ঞানী লোক ছিলেন, এবং তোমার একটি বিরল সহজাত গুণও রয়েছে।'

'আমার? গুণ?'

'হ্যাঁ, তুমি একজন ভালো শ্রোতা। কেবল মানুষের কথাই শোনো না, সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনাও করো।' শুয়ে পড়েছিল, আবার উঠে বসলো সে। 'তো অনেক গল্প হলো, এবার উঠতে হয়। তোমার টাইগার মনে হচ্ছে আসবে না এখানে।'

আমরা পাল খাটিয়ে সবে রওনা দিয়েছি এমন সময় দেখতে পেলাম, তরতর করে রাজহংসীর মতো জল কেটে এগিয়ে আসছে ক্যাপটেন টমাসের ত্রিমাস্তুল জাহাজ।

উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলাম আমরা, সাকিম হাল ধরলো, আমি

মাস্তুলে দাঁড়িয়ে টুপি নাড়াতে লাগলাম।

পাল নামিয়ে আমাদের কাছে এলো টাইগার। বো রেইল আর অ্যাফটে কয়েকটা পরিচিত মুখ চোখে পড়লো। ক্যাপটেন টমাস এবং করনিভো।'

আর জুবলেন ··সেই পুরোনো বন্ধু জুবলেন।

এবং তারপর আরো একটি মুখ। বিস্ময়ের ধাকাটা সামলে উঠতে একটু সময় লাগলো আমার। ভালো করে চোখ কচলে দেখলাম··· না, সত্যি···রেবেকা!

চুল উড়ছে বাতাসে, আমার পানে চেয়ে হাসছে, আনন্দে উত্তেজনায় শিহরণে জ্বলজ্বল করছে ওর দুচোখ, দৃষ্টিতে স্পষ্ট আমন্ত্রণ।

'সাকিম, দেখেছো?' আধপাক ঘুরে বললাম। 'এ-জন্যেই আমি এত স্বপ্ন দেখি।'

'দেখেছি, সত্যি দেখেছি। কিন্তু, দোস্ত, ও স্বপ্নে দেখার জিনিস নয়, নিজেই স্বপ্ন।'

বারো

একঘণ্টা বাদে ক্যাপটেনের কেবিনে বসে সব কিছু খুলে বললাম আমি।

টমাস পায়চারি করতে করতে নীরবে সবটা শুনলেন আগে, মাঝেমধ্যে মাথা দুলিয়ে সায় দিলেন। 'আমরাও তাই সন্দেহ করেছিলাম,'

বললেন তিনি, 'কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিলো না। তুমি নিরুদ্দেশ হয়েছো এটা আমরা বোঝার আগেই জলি জ্যাক নোঙর তুলে নদী পেরিয়ে গেছে।'

একটু থামলেন তিনি। 'তোমার কাছে ফার আছে, না?'

'ওগুলো উদ্ধার করা সহজ হবে না, বিশেষ করে লিনেকারের অগোচরে। ওর জাহাজে, ক্যাপটেন, আপনার চেয়ে কামানের সংখ্যা বেশি।'

'হুঁ। আমিও কোনো ঝামেলায় যেতে চাচ্ছি না।' ভ্রূ কোঁচকালেন তিনি। 'তবে তোমার ফারগুলো উদ্ধার করতে হবে, তারপর উপকূলের উজানে চলে যাবো। ভাটিতে স্প্যানিশরা রয়েছে।' আমার পানে তাকালেন। 'তুমি কী বলো?'

'রওনা দিন···এক্ষুণি। লিনেকার প্রস্তুত হবার আগেই ফার নিয়ে সরে পড়তে হবে। আপনার জাহাজ এখানে এসেছে টের পাওয়ামাত্র সতর্ক হয়ে যাবে সে।'

টমাস কমপ্যানিয়নওয়েতে গেলেন এবং মিনিটকয়েক পর ফিরে এলেন। 'পানির গভীরতা সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত তো?'

'হ্যাঁ···আমি আর সাকিম যাবো ওগুলো আনতে।'

ডেকে ফিরে গেলেন তিনি। রেবেকা তার স্কার্টের ভাঁজ সমান করলো। 'ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম আমি,' শান্ত গলায় বললো। 'প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল তোমার বুঝি কোনো অমঙ্গল হলো।'

'তুমি এলে যে বড়?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

ও হাসলো। 'বাবাকে বোঝালাম, লনডনে আমি নিরাপদ নই। আর উনিও বোধ হয় এটাই চাইছিলেন। দরকার ছিলো শুধু একটা ছুতো।'

'ডাঙায় নেমেছো ?'

'না, না।'

'খুব সুন্দর,' বললাম। 'হরেক রকমের গাছপালা, ফুল। তবে,' যোগ করলাম আমি, 'কুমির ভাল্লুক ইনডিয়ান এরাও রয়েছে।'

'কুমির আর ইনডিয়ান আমাদের চোখে পড়েছে। ইনডিয়ানদের সাথে পথে এক জায়গায় ব্যবসাও করেছি। ওরা অবশ্যি ডাঙায় ডেকেছিল আমাদের, আমরা যেতে সাহস পাইনি।'

'তুমি এসেছো বলে আমি খুশি হয়েছি,' সহসা বললাম। 'তোমাকে খুব মনে পড়ছিল।'

আমার পানে তাকালো সে। 'তাই? ওই কুমির, ইনডিয়ান এদের নিয়ে বিব্রত থাকার পরেও? আমার কিন্তু ভারি অবাক লাগছে।'

'ওদের কবল থেকে পালাবার মতো একটা না একটা রাস্তা সব সময়ই থাকে,' হাসতে হাসতে বললাম।

'আর আমার কাছ থেকে?'

'সম্ভাবনা কম, আর আমিও সে-চেষ্টা করবো বলে মনে হয় না।'

পাটাতনের ফাঁক দিয়ে ডাকলেন টমাস। 'অ্যালান? একটু ডেকে আসো তো।'

স্টারবোর্ড বো বরাবর ডাঙা দেখা যাচ্ছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ খাঁড়িতে যাবার পথ ওটা। এই খাল ধরে আমরা আগেও গিয়েছি, তাই জাহাজ ওখানে ঢোকার সময় ক্যাপটেনের পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'তোমার সঙ্গের ওই লোকটা মুর?'

'হ্যাঁ, চমৎকার মানুষ, শিক্ষিত।' রুফিসকো এবং ইনডিয়ানদের চকিত হামলার ঘটনাটা জানালাম ওকে।

'শুনেছি ওদের অনেকে শান্তিপ্রিয়,' মন্তব্য করলেন টমাস।

'কেউ কেউ, কিন্তু অন্যরা একদম এর বিপরীত। আমাদের ইউ-রোপিয়ানদের মধ্যে যেমন মিল খুব কম, স্প্যানিশদের সাথে আমাদের যুদ্ধ চলছে বা শুরু হবার মুখে, সমুদ্রে কোনো জাহাজেরই নিরাপত্তা নেই, ইনডিয়ানদের অবস্থা এতটা না হলেও প্রায় কাছাকাছি, কখনো দেখা যাবে পুরো গোত্রটাই হিংস্র, আবার কখনো হয়তো দেখবেন দু-একজন বাদে মোটামুটি সবাই আপসপূর্ণ। ওরা এই ভালো ব্যবহার করলো তো আরেকবার খেপে উঠলো। শক্তি সাহস ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি ওদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা সমীহবোধ নেই।'

দক্ষিণ খাঁড়িতে গিয়ে যখন কোনো জাহাজ চোখে পড়লো না, আমরা নিচে গেলাম। বহুদিন বাদে আমি সভ্য সুস্বাদু খাবার খেতে বসলাম।

খেতে খেতে এখানে আমার বসতিস্থাপনের ইচ্ছার কথা জানালাম ওঁকে। 'চমৎকার দেশ, ইংল্যানডের কোনো কিছুই এর সাথে পাল্লা দিয়ে পারবে না। ভাবছি ইনডিয়ানদের সাথে ব্যবসা চালিয়ে যাবো, এবং সম্ভব হলে খানিকটা জমিও কিনবো ওদের কাছ থেকে।'

'এত তাড়াহুড়োর কী আছে,' আপত্তি জানালেন টমাস। 'তুচ্ছ কারণে তোমার বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে ওরা। আমি এই ইনডিয়ানদের সাথে কারবার করিনি বটে, কিন্তু এ-ধরনের অন্য লোকদের সঙ্গে করেছি, ওরা অল্পতেই ক্ষুব্ধ হয়। ভুল বোঝাবুঝির দরুন যে-কোনো একজনই ঝামেলা পাকানোর জন্যে যথেষ্ট। আর সেটা ঘটাও বিচিত্র নয়, ওদের মূল্যবোধ বিশ্বাস আমাদের চেয়ে আলাদা।'

'স্বীকার করছি···তবে আমি শিখে নেবো।'

'প্রথমে ইংল্যানডে ফিরে চলো তুমি,' বললেন টমাস। 'একজন ভদ্রলোক তাঁর উত্তরাধিকারী করতে চান তোমাকে। সম্পত্তিটাও

নেহাত ছোট নয়।'

একমুহূর্ত চুপ করে রইলাম আমি। ওনাকে কীভাবে বোঝাবো এই বিশাল দেশ, এখানকার শূন্যগর্ভ নদনদী, এর অপার রহস্য কী প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে আমার মনে?

'পাহাড়ের ওপাশে আমাকে যেতে হবে,' বললাম।

'পাহাড় জীবনে সব সময়ই আসবে,' বিরস গলায় বললেন টমাস। 'ধরনটাই যা আলাদা। ঝোঁকের মাথায় সিদ্ধান্ত নিও না, আরেকটু ভেবেচিন্তে দেখো। এই বর্বরদের মাঝে, শেষ-পর্যন্ত নিজেই বর্বরে পরিণত হওয়া ছাড়া, তোমার কী ভবিষ্যৎ রয়েছে?'

পরে জুবলেন আর করনিভোর সঙ্গে ডেকে দেখা হলো আমার। আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল ওরা। 'আসার পথে টুকটাক কারবার করেছি,' বললো করনিভো। 'ভালো লাভ হয়েছে।'

ইতিমধ্যে সাকিমের সঙ্গে ভাব জমে উঠেছে ওদের। কবরে-শায়িত রুফিসকোর কথা ভাবলাম আমি। সূর্যকিরণ মদ আর মেয়েমানুষের সঙ্গ চেয়েছিল সে। একদিন কোথাও, ওর স্বপ্নের কোনো জায়গায় গিয়ে, আমি ওর আত্মার শান্তি কামনা করে মদ পান করবো।

'সাকিম। জীবনে তুমি তো অনেক কাজই করেছো, জাহাজ বানিয়েছ কখনো?'

'হ্যাঁ। যুদ্ধ কিংবা ঝড়ে বিধ্বস্ত বহু জাহাজ মেরামতও করেছি।' আমার মনের কথাটা যেন ধরতে পারলো সে। 'একটা জাহাজের কথা ভাবছো?'

'তাই···পটাশের চালান পাঠাতে চাই।'

'পটাশ?'

'কাচ, সাবান এগুলো বানাতে লাগে। ওক বা আর কোনো শক্ত কাঠ পুড়িয়ে তার ছাই সংগ্রহ করে ইংল্যানডে পাঠাবো।'

'দাম পাবে ?' সংশয়ের ছাপ ফুটলো সাকিমের কণ্ঠে।

'পাবে,' বললো করনিভো, 'প্রতি পাউনডে একজন গ্লাসমেকার দশ শিলিং দেবে। এখানে প্রচুর ওক বন রয়েছে, প্রয়োজন শুধু প্রচেষ্টা।'

'আমি ক্ষত্রিয়,' ঘৃণার সুরে বললো জুবলেন।

'এবং গরীব,' একমত হলো করনিভো। 'ক্ষত্রিয় হলে কি একটু স্বচ্ছলভাবে বাঁচার চেষ্টা করতে নেই ?'

'তা অবশ্যি ঠিক,' স্বীকার করলো জুবলেন।

সুন্দর আবহাওয়া, বাতাসও রয়েছে। ধীর গতিতে উজানে যাচ্ছে ত্রিমাস্তুল গুহার কাছাকাছি আসতে আমি সাকিম আর জুবলেন ডিঙি নিয়ে কূলে গেলাম। অ্যাসটার্নে বাঁধা ছিলো ওটা। ফারগুলো জাহাজে নিয়ে আসতে বেশিক্ষণ লাগলো না। গ্যারি লিনেকার বা তার ক্রু কিংবা ইনডিয়ানদের দেখতে পেলাম না।

উজানে নদীর প্রথম বাঁকের মুখে পৌছে সাবধানে হুইল ঘোরাতে লাগলাম আমরা, স্টারবোর্ড বো স্রোতের ধাক্কায় ঘুরে গেল ধীরে ধীরে। এ-বার ভাটিতে নদীর অপর তীরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

নিচু-দ্বীপটা সেই আগের মতোই লাগলো দেখতে। আবার ডিঙি নিয়ে আমি সাকিম আর জুবলেন ডাঙায় গেলাম। এর আগে একবার আসা সত্ত্বেও জাহাজের খোলটা খুঁজে পেতে সময় লাগলো। অনেক ঝামেলা পোয়াতে হলো ফারগুলো বয়ে আনতে। টাইগারে পৌছে ওগুলো ওপরে নিয়ে গেল সাকিম।

সহসা শোরগোল উঠলো ডেকে, কামানের গর্জনে তালা লেগে

গেল কানে। বাঁক ঘুরে মাত্র নদীতে ঢুকলো জলি জ্যাক কাছেপিঠে একটা গোলা এসে পানিতে ফাটলো, টাইগারের সদ্য-তোলা পালে তখন হাওয়া ধরেছে, আচমকা দ্রুত ঘুরে গিয়ে সামনে এগোলো জাহাজটা।

হঠাৎ স্টারবোর্ড ঘুরে যাওয়ায় ডিঙির গায়ে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো, আমি তখন বোতে দাঁড়িয়ে টোলাইন বাঁধা সবে শেষ করেছি মাথা নিচে দিয়ে পানিতে পড়ে গেলাম।

ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছি আমি, বাতাসের জন্যে আঁকুপাঁকু করছে ফুসফুস, মাছের ডানার মতো করে দুহাতে জল কেটে ভেসে উঠলাম ডিঙিটা টাইগারের পিছুপিছু বারো ফুট দূরে চলে গেছে। আরেকটা কামানের গর্জন হতে দেখলাম জলি জ্যাক এগিয়ে আসছে পরমুহূর্তে আরেকটা গোলা ফাটলো, থরথর করে কেঁপে উঠলো জ্যাক, রেইলের খানিকটা অংশ উড়ে গেল।

আর্তচিৎকার উঠলো একটা, তারপর আরেকবার কামান দাগলো টাইগার জলি জ্যাক পাশ কাটিয়ে গেল টাইগারকে, আমি দেখলাম স্টার্নের কামানটা রেডি করার জন্যে সবাই ছুটছে ডেক ধরে।

জায়গায় দাঁড়িয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে সহসা উপলব্ধি করলাম জ্যাক আমার সমান্তরালে চলে এসেছে, মাঝের দূরত্ব পঞ্চাশ ফুট হবে কি না সন্দেহ। নিমেষে ডুব সাঁতার দিয়ে দ্বীপের পানে ছুটলাম আমি। কূলে পৌঁছে হামাগুড়ি দিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিলাম।

ওদিকে জ্যাক তাড়া করছে টাইগারকে।

জংলা ঝোপের ভেতরে বসে রয়েছি আমি। গায়ের কাপড় এবং

তলোয়ার আর ছোরাটা ছাড়া কিছু নেই সঙ্গে।

নিশ্চয়ই কোনো ইনলেটে ঘাপটি মেরে বসেছিল জলি জ্যাক, গাছ-পালার আড়ালে ঢাকা পড়েছিল মাস্তুল, আমরা ক্ষার নিতে এসে ওর চোখে ধরা পড়ে গিয়েছি। এখন সে পিছুধাওয়াতে ব্যস্ত, জাহাজ-দুটোর মধ্যে ওর গতিপাল্লা বেশি। মাল্লা এবং অস্ত্রপাতিও বেশি—আসলে ওটাকে প্রায় যুদ্ধজাহাজ বলা চলে।

টাইগারের সুবিধে একটাই: এগিয়ে রয়েছে, এবং বাতাস তার অনুকূলে। পালিয়ে যাওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর নেই।

কিন্তু আমার?

আমাকে এখানে, এই দ্বীপেই পড়ে থাকতে হবে···একাকী।

তেরো

জলি জ্যাক যখন বহু দূরে চলে গেল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। সারা গা জলে কাদায় একাকার হয়ে রয়েছে। সমুদ্রের জলো হাওয়ায় শীতল হয়ে উঠেছে প্রকৃতি। আমার চার্ট অভিজ্ঞতা এবং ঋতুবৈশিষ্ট্য থেকে মনে হচ্ছে এটা দক্ষিণের কোনো এলাকা হবে, অথচ বাতাসে তার লক্ষণমাত্র নেই।

জাহাজের পরিত্যক্ত খোলে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। পাথর ঠুকে কীভাবে আগুন জ্বালাতে হয় জানি, কিন্তু এখন শতচেষ্টাতেও ধরলো

না। শেষ-পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে বালুতে গর্ত খুঁড়ে ঘাস বিছিয়ে ঘুমের আয়োজন করলাম। ঘুমিয়ে পড়লাম···তবে তলোয়ারটা হাতের কাছে রাখতে ভুললাম না।

আরেকপশলা বৃষ্টি দিয়ে শীত শীত ভোর হলো। আমার জামা-কাপড় এখনো শুকোয়নি। আবার পাথর নিয়ে বসলাম।

একটু বাদে ক্ষীণ ধোঁয়ার সাথে স্ফুলিঙ্গমত হতে আস্তে ফুঁ দিলাম, নিভে গেল। ফের ঘষতে শুরু করলাম পাথর, হাতে ব্যথা হয়ে গেল, তারপর আবার ফুলকি ছুটলো। আস্তে, খুউব আস্তে ফুঁ দিলাম আমি। ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো শিখা, শুকনো ঘাসে ছোট্ট একটা আগুন জ্বলে উঠলো।

এ-বার বাইরে গিয়ে চারপাশে তাকালাম সতর্ক দৃষ্টিতে।

টাইগার কোথায় জানি না। পালাতে পেরেছে না জলি জ্যাক দখল করে নিয়েছে, তাও বলতে পারবো না। আমি যে বেঁচে রয়েছি এ-কথাও হয়তো জানে না ওরা।

মুষড়ে পড়ার মতো বহু কারণ হাতের কাছেই রয়েছে, কিন্তু, আগুন পোয়াতে পোয়াতে, সহসা আমার সব দুর্ভাবনা দূর হয়ে গেল

আমি একা। ক্যাপটেন টমাস যদি আদৌ নিশ্চিত হয়ে থাকেন যে আমি বেঁচে আছি, এবং টাইগার শেষ-পর্যন্ত রক্ষা পেয়েও থাকে, তবু হয়তো এমন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে আমাকে উদ্ধার করতে আসতে পারবে না।

ওরা চলে গিয়েছে, আমি সম্পূর্ণ একা। নিজের ভালোমন্দ এখন আমাকেই দেখতে হবে।

আমি যে-জাহাজের খোলটায় আশ্রয় নিয়েছি সেটা ভালো অবস্থায় আকারে প্রায় টাইগারের সমান ছিলো। চুলচেরা হিশেবনিকেশ

করার মতো কোনো উপায় আজ আর নেই, তবে বোলাইনটা অস্বাভাবিক রকমের বড়। ওটার বেশির ভাগ বহুকাল আগে বালুর নিচে চাপা পড়েছে।

বৃষ্টির মধ্যে বাইরে গিয়ে আগুন জিইয়ে রাখার জন্যে কিছু ডালপালা কুড়িয়ে আনলাম। পুরু তক্তা, বহু রোদঝড়জলেও জীর্ণ হয়নি, এই মুহূর্তে এটাই আমার কাছে স্বর্গতুল্য আশ্রয়। পেছনের অংশটা বোধ হয় ফোরক্যাসল হবে, তবে ওইদিকে এখনো যাইনি আমি।

আমরা প্রথমে যেটাকে ক্যাপটেনের কোয়ার্টার বলে ধারণা করেছিলাম আসলে ওটা তা নয়। ঠিক করলাম, সময়-সুযোগ পেলেই আরো অনুসন্ধানকাজ চালাবো। প্রয়োজন হলে কিছু দূর খুঁড়েও দেখবো।

এখন সব চেয়ে আগে চাই খাবার। আরেকটা তীর-ধনুক বানিয়ে চামড়ার ব্যবস্থা করতে হবে, গরম জ্যাকেট বানাবো। বর্তমানে পরনে যা রয়েছে, শার্ট আর ব্রীচেস, বেশি দিন টিকবে না।

নদীতীরে বড় বড় কচ্ছপ হরিণ ইতিপূর্বে কয়েকবার চোখে পড়েছিল, কিন্তু এখন একটাও নেই। আর এই আবহাওয়ায় মাছ ধরার কথা ভাবাই যায় না।

এই দ্বীপ এবং অপর তীরের মধ্যবর্তী নদীটা চওড়া নয়, কিন্তু স্রোত দুরন্ত। সাঁতার জানি তবে ততটা পটু নই; আর তা হলেও এই তীব্র স্রোতের সাথে পাল্লা দেবার ঝুঁকি নিতাম না, বিশেষ করে তলোয়ারটা যখন চলাফেরার বাধার সৃষ্টি করবে। তাই আগুনে আরো খড়ি গুঁজে দিয়ে কাছে সরে বসলাম, যতটা সম্ভব তাপ শুষে নিতে চাইলাম শরীরে।

কিন্তু অলসভাবে কাঁহাতক বসে থাকা যায়, খোলের ভেতর আব-

র্জনা ঘাঁটতে ঘাঁটতে কিছুক্ষণ পর প্রায় সাত ফুট লম্বা একটা লাঠি পেয়ে গেলাম। লাঠিটার মাথা ছোরা দিয়ে চেঁছে তীক্ষ্ণ করে আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে নিলাম। আপাতত এটাকে বর্শা হিশেবে ব্যবহার করা যাবে।

প্রচুর রীড এবং উইলো রয়েছে এখানে, সুতরাং তীর কোনো সমস্যা নয়। আর লাগবে একটা ধনুক। ওগুলো এখনই লাগছে না। হঠাৎ আরেকটা আইডিয়া এলো মাথায়, কাছেপিঠে যে-উইলো রয়েছে তা দিয়ে একটা মাছধরার ফাঁদ বানানো যায়।

বৃষ্টি মাথায় করে বাইরে গিয়ে গোটাবারো ডাল কেটে এনে ফাঁদ বানাতে বসলাম।

ভীষণ নিঃসঙ্গ পরিশ্রান্ত বোধ করছি। শীতে কাঁপছি ঠকঠক করে। একটু আগে নদীতে মাছ ধরার ফাঁদ পেতে এসেছি। খিদেয় নাড়ি-ভুঁড়ি জ্বলছে, অথচ স্কার্ভি ঘাস ছাড়া পেটে কিছু পড়েনি। গুটিসুটি মেরে আগুনের আরো কাছে গিয়ে বসলাম। আগুনটা আকারে ছোট, তবে লকলকে শিখা ক্ষুধার্তের মতো জ্বলছে। বেশি ধোঁয়া হবার আশঙ্কায় ইচ্ছে করেই ভেজা লাকড়ি ব্যবহার করছি না।

অবশেষে চোখ ধরে এলো আমার।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। রাত নেমেছে। কয়লা পুড়ছে আগুনে। এক মুহূর্ত নিঃসাড়ে পড়ে রইলাম, ছটুকরো জ্বলন্ত কয়লার প্রতি দৃষ্টি যেতে চমকে উঠলাম মনে মনে। আগুনের আওতার বাইরে ছিলো ওগুলো, এখানে এলো কীভাবে?

ঝোঁকের বশে তড়াক করে উঠে বসলাম, অল্পের জন্যে মাথাটা ছাতে গুঁতো খেতে খেতে বেঁচে গেল। আগুন নিভে এলে মোমবাতি

হিশেবে ব্যবহারের জন্যে কিছু ডালপালা গাদা করে রেখেছিলাম তার কয়েকটা ফেলে দিলাম আগুনে।

চটচট শব্দে বেড়ে উঠলো শিখা, চোখের পলকে আমার হাত চলে গেল বর্শার কাছে।

আগুনের ঠিক পেছনেই একটা কুমির চেয়ে আছে আমার পানে, ভাটার মতো জ্বলছে লাল চোখজোড়া। কষে ধমক লাগালাম, পাত্তা দিলো না, লোভাতুর দৃষ্টিতে ঠায় তাকিয়ে রইলো।

পালাবার সব পথ বন্ধ ডানে বাঁয়ে যে দিকেই যাই, ওর লেজের আওতার ভেতরে থাকছি। ছেলে বেলায় বাবা পই পই করে সাবধান করে দিয়েছেন, লেজের বাড়িতেই কুমির তার শিকারকে পানিতে ফেলে দেয়। চোয়ালজোড়া ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে, তীক্ষ্ণ ছোট ছোট দাঁতে লেগে আছে খাবারের কণা আমিষ না শ্যাওলাজাতীয় কিছু বুঝতে পারলাম না।

আশপাশে কোনো পাথর নেই। একমুঠো বালু নিক্ষেপ করলাম, কিন্তু জানোয়ারটা পাত্তা দিলো না। লেজটা সামান্য সরলো, এগিয়ে আসার জন্যে একটা পা উঠিয়ে আবার কী মনে করে নামিয়ে নিলো।

একটা মোটা লাকড়ি গুঁজে দিলাম আগুনে হঠাৎ খেয়াল করলাম আমার জ্বালানি কমে আসছে। আগুন নিভে গেলে কী উপায় হবে? একটা সাত ফুটি লাঠি দিয়ে এই দৈত্যটার বিরুদ্ধে কতটুকু কী করতে পারবো? তলোয়ার আছে, কিন্তু ওটার হাড় কতটা শক্ত জানি না। এই কুমিরটা প্রায় একটা দানব বিশেষ।

আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে নজর রেখে একপাশে ঈষৎ সরে গেল দানবটা—চোয়াল খুলছে, বন্ধ হচ্ছে।

আচমকা তেড়ে এলো, সজোরে ওর চোখ তাক করে বর্শা হাঁকা-

লাম। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, কাঁটাতে গিয়ে আঘাত করলো, ঝিনঝিন করে উঠলো আমার হাত। এ-ধরনের জন্তুর সাথে আদিবাসীদের মল্ল-যুদ্ধের কথা আমি শুনেছি, কিন্তু সেগুলো নিঃসন্দেহে এটার চেয়ে ছোট হবে আকারে। এটার দেহ একটা পূর্ণবয়স্ক খচ্চরের সমান।

আরেক পা এগিয়ে এলো ওটা, বিন্দুমাত্র আমল দিচ্ছে না আমার বর্শাটাকে। সমানে আগে বাড়ছে, বুঝতে পেরেছে ফাঁদে আটকা পড়েছি আমি দেয়ালে পিঠ ঠেকতে দেরি নেই।

ফের বর্শা দিয়ে ঘাই দিলাম, লাভ হলো না, তারপর আচমকা তলোয়ার চালালাম। ওর চোয়ালে একটা দীর্ঘ আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেল তলোয়ারটা—মাংস ভেদ করতে পারলো না।

বিশাল হাঁ করে আরো এক পা এগিয়ে এলো কুমিরটা, আমার দ্রুত নড়ার শক্তি রুদ্ধ হয়ে গেছে, পিঠ ঠেকে গেছে দেয়ালে। বর্শা দিয়ে ফের খোঁচা দিলাম, খপ করে দুপাটি দাঁতের মাঝে চাপ দিয়ে ভেঙে ফেললো দানবটা। এ-বার চকিতে তলোয়ার হাঁকালাম, এক ইঞ্চি বা তার কিছু বেশি পরিমাণ ভেতরে ঢুকলো। চোখের পলকে বের করে কোপ মারলাম কুৎসিত নাকের ওপর হাঁ করে ক্ষিপ্রবেগে সামনে লাফ দিলো কুমিরটা।

প্রায় চোদ্দ-পনেরো ফুট লম্বা দেহ, একলাফে ফুটছয়েক এগিয়ে এলো। আমি একপাশে সরে গিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিতে চেষ্টা করলাম, পা পিছলে পড়ে গেলাম বালুতে, বাঁ হাতটা অগ্নিকুণ্ডের পাশে পড়লো।

দানবটা এগিয়ে এলো, খানিক আগে যে মোটা লাকড়িটা গুঁজে দিয়েছিলাম আগুনে সেটা তুলে নিয়ে সবেগে ওর মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম।

একটা পিলে-কাঁপানো চিৎকার করে পিছু হটে গেল পশুটা, রাগে যন্ত্রণায় এ-পাশ ও-পাশ আছড়াতে লাগলো।

আগুনের পাশ দিয়ে গড়িয়ে বাইরে চলে এলাম আমি, বৃষ্টি উপেক্ষা করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললাম সামনের দিকে। আছাড় খেলাম বার-দুয়েক, উঠে দাঁড়ালাম। আমার গা ঘেঁষে নদীর দিকে ছুটে গেল কুমিরটা, ওর লেজের আঘাতে আবার পড়ে গেলাম। ঝপাত করে পানিতে লাফিয়ে পড়লো ও, ডুবে গেল। পরক্ষণেই আর্তচিৎকার করে মাথা জাগালো, তারপর আবার তলিয়ে গেল।

বালুর ওপর অনেকক্ষণ হাত পা ছড়িয়ে পড়ে রইলাম আমি। দূরে গুরুগুরু ডাকছে মেঘ। ধীরে ধীরে হাত গুটিয়ে নিলাম, তলোয়ারটা কীভাবে যেন মুঠিতে রয়ে গেছে এখনো। উঠে দাঁড়িয়ে তাকালাম চারপাশে, অবিরল বৃষ্টিধারায় ভিজে সপসপ করছে আমার জামা-কাপড়।

টলতে টলতে কোনোমতে ফিরে এলাম খোলের আশ্রয়ে। আগুন নিভুনিভু করছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে লাকড়ি। ওগুলো ফের জড়ো করে আরো কয়েকটা খড়ি গুঁজে দিলাম। ভেজা কাঠ, ধোঁয়া হলো, তারপর ক্রমশ ধরে উঠলো। কাঁপতে কাঁপতে আগুনের পাশে বসে পড়লাম।

ঘুমুনোর চিন্তা অবান্তর। তলোয়ারটা কোলের ওপর রেখে ভোরের অপেক্ষায় ঝিমুতে লাগলাম। অবশেষে ভোর এলো একসময়, কিন্তু সঙ্গে বয়ে আনলো ঝড়।

আকাশে দুরন্ত হাওয়া আর দলে-ভারি কালো কালো মেঘে লড়াই; হাওয়া মাঠে ঘূর্ণিপাক খেয়ে বাজপাখির মতো শোঁ করে নেমে আসছে, আবার মত্ত হাতির মতো উঠে যাচ্ছে—আর সেই সঙ্গে

নুয়ে পড়ছে আশপাশের যত গাছপালা ঝোপঝাড়। বৃষ্টির ছাঁট বালু গায়ে এসে বিঁধছে তীরের ফলার মতো।

দ্বীপের পেছন দিকে গেলাম আমি। আগের যাত্রায় ওখানে কিছু সবুজ অ্যাশ গাছ চোখে পড়েছিল। ওরই একটা লম্বা মোটা ডাল কেটে নিলাম, সুন্দর ধনুক হবে।

ফেরার পথে নুড়িপাথরও কুড়িয়ে আনলাম কয়েকটা, তারপর আগুনের ধারে বসে ধনুকটা মসৃণ করতে লাগলাম। ভীষণ ঝকমারি কাজ, কিন্তু শরীর গরম রাখতে সাহায্য করছে। তাছাড়া বেঁচে থাকতে হলে ধনুকটা আমার প্রয়োজন।

পরে, তলোয়ার হাতে নদীর পাড়ে গেলাম। ফাঁদটা আছে, তবে ভাঙাচোরা অবস্থায়। নিশ্চয়ই কোনো কুমিরের কীর্তি, মাছের লোভে কামড় বসিয়েছিল।

বিরক্তিতে ভরে উঠলো মন, কিন্তু হতাশ হলাম না। ওই ভাঙা ফাঁদটাকে মেরামত করে আবার নদীতে পেতে আসলাম।

রাতে ঘুম হলো না। একে খিদেয় পেট জ্বলছে, তার ওপর প্রতি-মুহূর্তে ভয় হচ্ছে এই বুঝি আরেকটা কুমির এলো।

ভোরে নদীতে গিয়ে দেখলাম তিনটে মাছ আটকেছে ফাঁদে। আগুনে ঝলসে খেলাম ওগুলো, অপূর্ব স্বাদ।

বৃষ্টি ছেড়ে গেল রাতে। আরো একটা মাছ পেলাম ফাঁদে। স্কার্ভি ঘাসের সঙ্গে মাছের কাবাব মোটামুটি ভালো জমলো।

এবার এই দ্বীপের কারাবাস থেকে পালিয়ে মূল ভূখণ্ডে যেতে হবে। দুবার দ্বীপের সব চেয়ে উঁচু জায়গায় উঠে নদীর ভাটিতে তাকালাম। কিছুই দেখতে পেলাম না।

চতুর্থ দিন তীর-ধনুক বানানো শেষ হলো। পাঁচ দিনের মাথায়

দ্বীপের শেষ-প্রান্তে ঝোপের ভেতর একটা বিশাল মরা গাছ আবিষ্কার করলাম, গাছটাকে কোনোমতে নদীতে নিয়ে ফেলতে পারলে…।

ষষ্ঠ দিন শার্টের পকেটে দুটো ঝলসানো মাছ নিয়ে ভেসে পড়লাম। আধঘণ্টা পরে মূল ভূখণ্ডে পৌঁছে বনের ভেতর দিয়ে হাঁটাপথ ধরলাম।

আমার জন্যে এখন সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় পোটাকার গ্রাম। কিন্তু ওর নিরাপত্তায়, রুফিসকোর মতোই, আমারও এখন আর আস্থা নেই। তাই উপকূলের উদ্দেশে রওনা হলাম।

সপ্তম দিন ভোরে একটা হরিণ শিকার করলাম।

চোদ্দ

বালুপাহাড়ে একটা নিচু ঝোপের ভেতরে বসে বসে কূলরেখা পর্যবেক্ষণ করছি আমি। চারপাশে এ-রকম আরো ঝোপ রয়েছে। খাঁড়িটা আগেই জরিপ করেছি, কাছে বা দিগন্তে কোনো জাহাজ নেই।

ইনডিয়ানদের ট্র্যাক চোখে পড়েছে কয়েকটা, কিন্তু ওদের দেখতে পাইনি। হরিণের মাংস মজা করে খেয়েছি, এখনো খানিকটা রয়েছে। নিয়মিত ব্যবহৃত হয় এমন ট্রেইল আছে, কিন্তু আমি ওগুলো এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট ট্রেইলে চলছি।

এর ফলে যাত্রা মন্থর হলেও আমার অনেক লাভ হচ্ছে—গাছপালা অরণ্যজীবন এবং এখানে কী আছে চিনছি, জানছি।

কিছু দিন আমাকে ডাঙায় থাকতে হবে। টাইগার যদি রক্ষা পেয়েও থাকে, ফিরে আসবে কি না বলা কঠিন। আর জলি জ্যাক দখল করে থাকলে বন্ধুদের সাথে আবার দেখা হবার সম্ভাবনা খুব কম। গ্যারি লিনেকারের খপ্পরে পড়েছে রেবেকা কথাটা ভাবতেই কেমন জানি লাগছে।

জ্যাক ফিরে আসবে। হয়তো টাইগারও তাই। এই খাঁড়িটা জলোচ্ছ্বাসের কবল থেকে, কিছুটা হলেও, নিরাপদ। ঝোড়ো আবহাওয়ায় এই জলরাশি ভয়াল হয়ে ওঠে সত্যি, তবে উঁচু পাড় খাঁড়ি আর সমুদ্রের মাঝে দেয়াল সৃষ্টি করেছে এবং আশ্রয় নেবার মতো অসংখ্য ইনলেট আর মোহানা রয়েছে।

লিনেকার সাপের মতো ঠাণ্ডা…ধূর্ত। খাঁড়ির এই সুবিধেগুলো তার চোখেও পড়বে। ওরা ফিরে না আসা পর্যন্ত, মাঝের এই সময়টুকু বেঁচে থাকতে হবে আমাকে, এবং সম্ভব হলে আরো ফার জোগাড় করতে হবে।

ফাঁদ পেতে কয়েকটা পশু শিকার করলাম : চারটে বিভার, একটা ভোঁদড়, গোটাকয়েক মিংক এবং তীর মেরে একটা শেয়াল।

ওই রাতে আরেকটা শেয়াল, মিংক এবং খরগোশ ধরা পড়লো ফাঁদে। প্রথম দুটোর শুধু ছাল রেখে দিয়ে তৃতীয়টা ঝলসে খেলাম। সকালের আলো ফুটতে সবচেয়ে উঁচু বালুপাহাড়টার উদ্দেশে রওনা হলাম।

ঝোপের ভেতর আচমকা একটা পায়ে-চলা পথের দিকে দৃষ্টি পড়তে থমকে দাঁড়ালাম। একটা ছোট হাইহিল বুটের ছাপ স্পষ্ট ফুটে রয়েছে।

সবিস্ময়ে ডানে বাঁয়ে তাকালাম, কিছু দেখতে না পেয়ে ট্রেইলটা

জরিপ করতে বসলাম।

ওই বুটজুতোর মালিক বালুপাহাড়ের দিক থেকে এসেছে, এবং ছাপটা বড়জোর দুদিন আগের। মেয়েটার সঙ্গে কমপক্ষে দুজন লোক ছিলো।

মেয়ে?

ছাপটা ছোট, খুব ছোট বুট, মেয়েছেলের পায়ের মাপ। ইনডিয়ান মেয়েরা বুট পরে না…সে-ক্ষেত্রে…রেবেকা।

ধোঁয়া…ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি। এক মিনিট পর ওদের ক্যাম্প চোখে পড়লো। তিনজন মাল্লা আর রেবেকা।

আমার দিকে মুখ করে অগ্নিকুণ্ডের ও-পাশে বসে আছে। ওর জন্যে গর্ব বোধ করলাম, মুখে হতাশা বা পরাজয়ের চিহ্নমাত্র নেই। মাথা উঁচু করে বসে আছে। 'ফাঁসিতে ঝুলতে হবে তোমাদের,' দৃঢ় সুরে বলছে ও, 'এখনো বুঝতে পারছো না কী করেছো।'

ওদের একটাকে চিনতে পারলাম। ডার্কলিং। 'তুমি একটা বোকা,' রূঢ় গলায় বললো সে। 'লোকে জানলে তো? সন্ধ্যের আগেই টমাসকে খতম করবো। সবাইকেই মারবো, কেবল জোয়ান ছুকরিরা বেঁচে যাবে।'

সঙ্গীদের পানে তাকালো সে। 'একে নিয়ে যাবো অন্যদের কাছে, নাকি এখানেই কিছুক্ষণ…'

আর দেরি না করে উঠে দাঁড়ালাম আমি, সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলো ও। সাবধান করার চেষ্টা করলাম না কোনো। এরা নীচ-প্রকৃতির লোক, রেয়াত করার অর্থ হয় না। ডার্কলিংয়ের একদম কাছাকাছি যে-লোকটা রয়েছে, ওকেই সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে হলো আমার। ওর উদ্দেশে একটা তীর ছুঁড়লাম।

দুরত্ব পনেরো ফুটও হবে না, অব্যর্থ লক্ষ্য। তীরটা ওর নাভীর ছইঞ্চি ওপরে গেঁথে গেল, অঁক করে একটা শব্দ বেরুলো মুখ থেকে, দুহাতে চেপে ধরলো ওটা, তারপর হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল।

চকিতে ঘুরে দাঁড়ালো অন্যরা, কিন্তু আমি ততক্ষণে বসে পড়েছি ঝোপের আড়ালে, আরেকটা তীর পরাচ্ছি গুণে। ডানের শেষ-প্রান্ত লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো কেউ, আমার শিকার তীর খেয়ে আধপাক ঘুরে যাওয়ায় ওরা বুঝতে পারেনি এর উৎসটা কোথায়।

দ্বিতীয় তীরটা তেমন কার্যকর হলো না, কোটের বোতামে ঘষা খেলো, তারপর উর্ধ্বমুখী হয়ে সামান্য আঁচড় কাটলো লোকটার গালে। এ-বার আমাকে দেখে ফেললো ওরা।

দুজনেই তলোয়ারহাতে ছুটে এলো আমার দিকে। রেবেকা—ঈশ্বর ওর মঙ্গল করো—পরনের স্কার্ট গুটিয়ে ঝোপের ভেতর পালিয়ে গেল।

ঘন ঝোপের মধ্যে বড় ধনুক বাগে রাখা সহজসাধ্য নয়, তাই ও চেষ্টা আর করলাম না, তাছাড়া লড়াই করার ইচ্ছেও নেই। ওর মতো আমিও পালিয়ে এলাম, একটু ঘুরে গিয়ে পথেই মিলিত হলাম। ঝোপঝাড়ে ওরা খুঁজছে আমাদের, টের পেলাম, তবে এ-দিকটায় নয়। রেবেকার হাত চেপে ধরে বনের ভেতর দিয়ে প্রথম বালুপাহাড়ের উদ্দেশে ছুটতে লাগলাম।

পাহাড়ের মাথায় একটা প্রাচীন ওক গাছ উপড়ে পড়ায় গর্তমত সৃষ্টি হয়েছে। ওই গর্তে বসে পড়লাম আমরা, আশপাশে ঝোপঝাড় রয়েছে বলে দেখতে পাবে না কেউ।

'তুমি আসতে অনেক দেরি করলে।' বললো রেবেকা।

'দেরি?' ফ্যালফ্যাল করে তাকালাম আমি।

'কোনো লোক যদি একজন ভদ্রমহিলাকে উদ্ধার করতে চায়'—

দুহাতে স্কার্টের কুচি সমান করলো ও—'তবে সেটা তাড়াতাড়ি করা উচিত। যাই হোক, তোমাকে ধন্যবাদ।'

'টাইগার কোথায়?'

'সামনের চড়ায় আটকা পড়েছে। আমাদের ফোরমাসট উড়িয়ে দিয়েছে লিনেকার। কয়েকজন নিহত হয়েছে, আর সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে।'

'ক্যাপটেন টমাস?'

'বাবার সাথে দু-চারজন আছে এখনো। লিলাকে নিয়ে তাঁর কাছেই যাচ্ছিলাম আমি। ভুল করে কিছু জিনিস জাহাজে ছেড়ে আসায় ও ফিরে যায়। আমি অপেক্ষা করছিলাম পথে, হঠাৎ পেছন থেকে এই লোকগুলো এসে বন্দী করলো।'

গাছপালার ফাঁক দিয়ে টাইগারকে আবছা দেখতে পাচ্ছি। চড়ায় আটকে গেছে, ফোরমাসট ভেঙে ঝুলছে একপাশে। আরেকটু ভালো-মত দেখার জন্যে ঈষৎ সরে বসলাম আমি, জাহাজের কাছে কোনো নড়াচড়ার আভাস পেলাম না, জলি জ্যাকেরও কেউ নেই।

'পরিস্থিতি কিছুটা আয়ত্তে না আসা অবধি,' বললাম, 'এখানেই অপেক্ষা করা উচিত আমাদের। এখান থেকে পুরো এলাকাটা দেখতে পাচ্ছি, এবং ফেরার সময় নিরাপদ ট্রেইলও বেছে নিতে পারবো।'

ধনুকটার প্রতি ওর নজর গেল। 'কোথায় পেলে?'

'বানিয়েছি। তেমন মজবুত নয়, তবে কাজ চলে।'

'আমার তো মনে হচ্ছে ভালোই। তুমি যখন ওই লোকটাকে মারলে, আনন্দে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম।' আমার পানে তাকালো রেবেকা। 'আমরা ভীষণ দুঃসময়ে পড়তে যাচ্ছি, না?'

কাঁধ ঝাঁকালাম, দৃষ্টি বালিয়াড়ির দিকে। 'খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত

হয়নি,' মাথা তুলিয়ে জাহাজটা দেখালাম, 'আবার ভাসানো যাবে বলে মনে হচ্ছে।'

এই পাহাড়ে ওঠার সবকটা রাস্তা জরিপ করে দেখলাম। এখানে লুকোনোর মতো জায়গা আছে বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। ফলে ওদের খুঁজে দেখার সম্ভাবনা কম, তবু যদি আসে···

'আমি খুব ক্লান্ত,' সহসা বললো রেবেকা। 'ঘুমুলে মাইনড করবে না তো?'

'ওটাই বরং বুদ্ধিমানের কাজ হবে,' সোজাসাপটা জবাব দিলাম। 'আমার বাবা সৈনিক ছিলেন। সর্বদা বলতেন, কোনো ভালো যোদ্ধা বসার মওকা পেলে দাঁড়িয়ে থাকে না, শোয়ার সুযোগ থাকলে বসে কাটায় না, এবং খাবার পেলেই খেয়ে নেয়।'

একটা ঘন ঘাসে-ছাওয়া জায়গা দেখিয়ে দিলাম। পরিষ্কার ছায়াচ্ছন্ন। শোয়ামাত্র ও ঘুমিয়ে পড়লো। ওর ঘুমন্ত সমাহিত মুখচ্ছবি দেখে হিংসে হলো, এত সহজে কি কখনো ঘুমিয়ে পড়তে পারবো আমি?

উঁকি মেরে দেখলাম নিচের জঙ্গলটা, কিছুক্ষণ পর একটা সোজা হালকা ডাল কেটে এনে পাথরে ঘষে ঘষে তীর বানাতে লাগলাম।

হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়। ফার নিয়ে ইংল্যানডে ফিরে যাবো। তারপর কিছু বিশ্বস্ত লোক জোগাড় করে নিয়ে আসবো এখানে। এটাই আমার স্বপ্নের দেশ।

তবে ফেরার পথে একটা বাধা রয়েছে। রুপার্ট গেনেসটার বিপদে ফেলার চেষ্টা করতে পারে।

নাহ্, ওকে আর দেরি করাবো না, ফিরে গিয়েই ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলবো চিরতরে।

এখন ক্যাপটেন ব্রায়ান টমাসকে খুঁজে বের করে ফেরার প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রথমে একটা প্রতিরক্ষাব্যূহ গড়ে তুলতে হবে, তারপর জাহাজের মেরামত। আর সেটা যদি সম্ভবপর নাই হয়, আরেকটা রাস্তা আছে।

জলি জ্যাক দখল করবো।

এতে গ্যারি লিনেকারের উচিত সাজা হবে, দ্বীপান্তর হবে। আবার টাইগারের দিকে তাকালাম। চড়ায় ভালোমতই আটকা পড়েছে, কিন্তু ওই মাস্তুলটা ছাড়া আর কোথাও মারাত্মক চোট লেগেছে বলে মনে হচ্ছে না রেবেকার ভাষ্য অনুযায়ী দুটো গোলা পড়েছিল। ফাঁক-গুলো বোধ হয় বুজিয়ে ফেলা যাবে।

আমার ফার এবং আরো কিছু পণ্য ওই জাহাজে রয়ে গেছে এখনো।

আবার যখন তাকালাম, রেবেকা চোখ মেলেছে। আমাকে দেখে খানিকটা হকচকিয়ে গেল, তারপর ধীরে ধীরে বোধশক্তি ফিরে এলো। উঠে বসলো, আপনাআপনি হাত চলে গেল চুলে। 'অ্যালান।' এই প্রথম, আমার বিশ্বাস, ওই নামটা উচ্চারণ করলো সে। 'এখন কী করবো?'

'টাইগারে যাবো,' বললাম।

'টাইগার। কিন্তু ওরা যে ধরে ফেলবে আমাদের।'

'এখানে বসে থেকে লাভ হবে না। ক্যাপটেন টমাস একটু আগে বা পরে তাঁর জাহাজে ফিরবেনই। ওখানেই তাঁর প্রতীক্ষায় থাকবো আমরা।'

'আর লিনেকার যদি আগে আসে তো?'

'ওর জন্যে তৈরি হয়ে থাকবো। আমার প্রচুর ক্ষতি করেছে,

এ-বার তাকে মাসুল গুণতে হবে।'

শেষ-বিকেলের আলো খাঁড়ির ওপর দিয়ে গুটিয়ে আসছে ক্রমশ পেছনে, বালুর ওপর, ফেলে আসছে ক্ষীণ রুপোলি আভা। গুটিগুটি পায়ে অন্ধকার নামছে পাহাড়ে, গাছের মাথা থেকে মুছে যাচ্ছে রঙের শেষ চিহ্নটুকু। অবশেষে, আঁধার যখন জাঁকিয়ে বসলো মোটামুটি, আমরা জাহাজের কাছে গেলাম।

অ্যাফট থেকে একটা দড়ির মই ঝুলছে। তলোয়ারটা কোষবদ্ধ করে ডেকে উঠে গেলাম আমি। ঘুটঘুটে অন্ধকার, জনমানবের সাড়া নেই।

রেবেকা তরতর করে উঠে এলো, ওর স্কার্ট কোনো বাধার সৃষ্টি করলো না। একটা কেবিনে ঢুকলাম আমরা, অন্ধকার থমথমে বিছানা থেকে একটা ভারি কম্বল নিয়ে স্টার্ন লাইট ঢেকে দিলাম আমি, তারপর ইস্পাতে পাথর ঘষে আলো ধরালাম।

লঙ্কাকাণ্ড ঘটে গেছে। সামান্য খুঁজতেই যা চাইছিলাম পেয়ে গেলাম আমি। একটা পিস্তল, গুলি ভরে নিলাম ওতে। রেবেকার দরকার জামাকাপড়, পেয়ে গেল সে।

'কাপড় বদলাবো,' আমার পানে চেয়ে বললো।

'জলদি করো,' জবাব দিলাম আমি। সন্তর্পণে বাইরে এসে দরজাটা ভিজিয়ে দিয়ে মেটস কোয়ার্টারে গেলাম। না, বন্দুকের আলমারিটা অক্ষতই রয়েছে—তার নাগালের মধ্যেই আছে ভেবে লিনেকার এখনো লুট করেনি, ক্যাপটেন টমাসকে ধরার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী সে।

বাল্কহেড থেকে একটা কুঠার এনে আলমারির তালা ভেঙে একটা মাসকেট এবং আরো একটা পিস্তল তুলে নিলাম। দুটোতেই গুলি

ভরে নিলাম। তারপর আফটার রেইলের ওপর যে-সুইভেল গানটা বসানো আছে, সেটাকেও রেডি করলাম। তীরের অনেকটা এলাকা কাভার করতে পারবে এটা। স্টারবোর্ড সাইডে ঈষৎ কাত হয়ে আছে টাইগার, পোর্ট রেইলের সুইভেল গানটাও কাজে আসবে।

গ্যালি থেকে খাবার নিয়ে ফিরে এলাম কেবিনে, নক করে ঢুকলাম। ছাইরঙের সাধারণ স্কার্ট, শাদা কাফ আর কলারে চমৎকার মানিয়েছে রেবেকাকে, কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস পুঁটুলি বেঁধে সরে পড়ার জন্যে তৈরি হয়ে আছে।

হ্যাম রুটি পেঁয়াজ এবং শুকনো ফল দিয়ে আহারে বসলাম। দু-জনের জন্যে গ্লাসে চোলাই ঢাললাম আমি, তারপর নিজেরটা নিয়ে ডেকে বেরিয়ে এলাম।

রীতিমত অন্ধকার, তবু যতটুকু দেখতে পেলাম বীচ ফাঁকা। নিচ থেকে আরো খাবার নিয়ে এসে পোঁটলায় বেঁধে নিলাম।

'চলে যাচ্ছো,' আমাকে বাঁধাছাঁদা করতে দেখে রেবেকা জিজ্ঞেস করলো। ওর গলায় অনিচ্ছার সুর ধ্বনিত হলো, এর কারণ বুঝতে পারলাম আমি।

'একেবারে বাধ্য না হলে,' বললাম, 'আজ রাতে আর যাচ্ছি না। এখন তুমি একটা বাংকে ঘুমিয়ে পড়ো। যাবার ভাবনা কাল ভাবা যাবে।'

'তুমি?'

'পাহারায় থাকবো,' বললাম।

আলতোভাবে দরজা টেনে দিয়ে চলে গেল ও। আমি অন্ধকারে মিশে একটা সুইভেল গানের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওর অবস্থা বুঝতে পারছি, আমি নিজেও ভীষণ পরিশ্রান্ত।

রেইলে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম, সবগুলো পেশী প্রতিবাদ জানাচ্ছে, এক মিনিটের জন্যে হলেও শুয়ে পড়তে বলছে আমাকে।

মৃদু সুরে ঢেউ ভেঙে পড়ছে কূলে। বনের ভেতর কোনো আগুনের আভা চোখে পড়ছে না—ভয়ঙ্কর শান্ত পরিবেশ।

পনেরো

চোখ বন্ধ হয়ে গেল আমার: পরমুহূর্তে আবার খুলে গেল, মৃত্যুহিম-শীতল ভয় অনুভব করলাম।

ঘুমুলে মরতে হতে পারে। তাছাড়া ও, যাকে আমি ভালোবাসি, একা হয়ে পড়বে। সহসা প্রেমানুভূতি জাগ্রত হওয়ায় কিছুটা বিস্ময় বোধ করলাম বৈকি।

একটা সহজ সুন্দর ভাবনা। সত্যি কি তাই? রেবেকা টমাসকে ভালোবাসার পেছনে কারণ অনুসন্ধান করতে বসলাম। সুন্দরী; ভদ্র মার্জিত অথচ সাহসী নির্ভীক। বুদ্ধিমতী।

এই নতুন উপলব্ধিতে আমার সমস্ত শ্রান্তি দূর হয়ে গেল আমি প্রেমে পড়েছি। কিন্তু রেবেকা টমাস, এত লোক থাকতে, আমাকে ভালোবাসবে কেন বুঝতে পারছি না।

এমন কোনো প্রমাণ পাইনি যা থেকে বুঝবো ও সত্যি আমাকে চায়। বস্তুত চাইবার মতো কারণও নেই আমি একজন সাধারণ মানুষ, আবেগের বালাই নেই বললেই চলে—খানিকটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী,

এই পর্যন্ত।

তবে ভবিষ্যতে একটা কিছু যে হবো তাতে সন্দেহ নেই।

আমি যে-মেয়েকে ভালোবাসি, সে অভিজাত ঘরের। ওকে একান্ত-ভাবে পেতে চাইলেই তো আর হবে না, তুলবো কোথায়? একজন ভদ্রমহিলার ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে।

ঘুরে-ফিরে শেষ-পর্যন্ত জুবলেনের মন্তব্যেই এসে ঠেকছি তাহলে। আমার কাছে তলোয়ার রয়েছে। বাস্তবিক আছেও তাই, এবং তলোয়ার দিয়ে রাজ্যজয় আর রক্ষা দুই করা যায়—আবার তা করতে গিয়ে মারা পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

হঠাৎ খোলের গায়ে ধাক্কা খেলো কিছু···আবার···তলোয়ার উঁচিয়ে ধরলাম আমি। ডেকের ওপর খালি পায়ে হাঁটছে কেউ··· কয়েকজন।

কথা বললো একজন। 'জাহাজে কেউ নেই, ক্যাপটেন। কবরখানা মনে হচ্ছে। হ্যাচের ঢাকনাও বন্ধ, মালপত্র ভেতরেই আছে।'

'মই থেকে সরে যাও।' গ্যারি লিনেকারের কণ্ঠ ভেসে এলো। 'আমি আসছি।'

মইয়ের সামনে ভিড় করে আছে ওরা, সুইভেল গানটা ওইদিকে ঘুরিয়ে দিলাম আমি।

'ক্যাপটেন তোমার জন্যে উপহার।' চেঁচিয়ে বলেই ট্রিগারে চাপ দিলাম।

আগুন দেখা দিলো নলের মুখে, শব্দ করে গুলি ছুটলো, মরণচিৎ-কার জুড়লো কেউ। এ-বার পিস্তল ছুঁড়লাম একজনকে লক্ষ্য করে, লোকটা অন্যদের থেকে একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিল। তারপর আমার দ্বিতীয় পিস্তলটাও ব্যবহার করলাম এবং আচমকা ওটার শব্দকে

ছাপিয়ে আরেকটা পিস্তল গর্জে উঠলো— এটা কেবিনের দরজা থেকে এসেছে।

রেবেকা, বেঁচে থাকো।

বুনো চিৎকার বেরিয়ে এলো আমার গলা থেকে, ছুটে গেলাম ওদের দিকে। ওরা সংখ্যায় কজন জানি না, অন্ধের মতো তলোয়ার ঘোরাতে লাগলাম।

হঠাৎ নিচে আরো কয়েকটা পদশব্দ শোনা গেল, আর্তনাদ করে উঠলো একজন, তারপর কেউ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কে ওখানে?'

এর অর্থ আমি একা নই, নিচেও লড়াই চলছে। এক পা পিছিয়ে এসে একজনের ঘাড় লক্ষ্য করে তলোয়ার চালালাম, মুহূর্তে কবন্ধ হয়ে গেল লোকটা।

রেইল টপকে পালিয়ে গেল একজন, আমার পাশ থেকে আরেকটা পিস্তল গর্জে উঠলো। রেবেকা, কাঁধ অবধি এলো চুল, রণরঙ্গিনী মূর্তি, দুহাতে দুটো পিস্তল শোভা পাচ্ছে। ওগুলো সে কোথায় পেলো জানি না।

মইয়ের মাথায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, ওর কণ্ঠনালীতে তলোয়ার ঢুকিয়ে ওপর দিকে চাড় দিলাম আমি। ও যদি এরপরেও বেঁচে যায়, সারা জীবন চেরা চিবুক বয়ে বেড়াতে হবে।

আবার ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পেলাম নিচে, একটা কি দুটো গুলির আওয়াজ, তারপর অনেকগুলো কণ্ঠস্বরের মধ্য থেকে একটাকে ক্যাপটেন ব্রায়ান টমাসের বলে চিনতে পারলাম।

'আসুন, ক্যাপটেন,' উৎফুল্ল সুরে বললাম আমি, 'তবে সাবধান, সিঁড়িতে কেউ ঘাপটি মেরে থাকতে পারে।'

'কে, ওসমান?'

'হ্যাঁ, আমার পাশে আপনার মেয়ে, খুব ভালো গুলি ছুঁড়তে পারে।'

আমার কনুই ঘেঁষে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে, লম্বায় আমার কাঁধের চেয়ে সামান্য বেশি হবে। 'তুমি টের পেলে কীভাবে?'

'ঘুমোইনি তোমার চোখে গভীর ঘুম দেখে ভাবলাম ওটা তোমারই পাওনা।'

'আর আমি তোমার জন্যে জেগে ছিলাম,' বললাম।

টমাস ডেকে উঠে এলেন। আসন্ন ভোরের আলোয় দেখলাম মলিন হয়ে আছে মুখ। 'আমি ভেবেছিলাম তোমরা দুজনেই মারা গেছো,' আস্তে আস্তে বললেন তিনি।

জুবলেন আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। 'গায়ে একটাও আঁচড় লাগেনি দেখছি?'

'না, লাগেনি,' বললাম, 'ওদের খবর কী?'

'ডেকে চারটে লাশ,' সন্তুষ্টির ছাপ ফুটলো করনিভোর গলায়। 'ওপর থেকে যে পড়ে গেছে সেও নেই। আমাদের হাতে খতম হয়েছে তিনটে, অন্যরা জখম নিয়ে পালিয়েছে'

'সাকিম?'

'এই যে, আমি এখানে, দোস্ত।'

'এসো,' বললেন টমাস, 'নিচে যাই। কর্টনি, তুমি আর ফিৎসপ্যাট্রিক ডেকে থাকো। তোমাদের দুজনের জন্যে এক বোতল করে রাম পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাকি সবাই নিচে গিয়ে তৈরি হও। যে-কোনো মুহূর্তে হামলা আসতে পারে।

'ওসমান,' আমার দিকে ঘুরলেন তিনি, 'কেবিনে এসো। কথা আছে।'

তলোয়ার কোষবদ্ধ করে রওনা হলাম। ঈষৎ টলছি, এ-যাত্রা ফাঁড়া কেটে গেছে দেখে ক্লান্তি আর কোনো বাঁধ মানছে না। একটা হাত এসে আমাকে ধরলো। 'আমি তোমার পাশে রয়েছি, অ্যালান। কিন্তু তুমি পড়ে গেলে সামাল দিতে পারবো না। সোজা হয়ে দাঁড়াও, লক্ষ্মীটি।'

নিজের কেবিনে ঢুকে গেল রেবেকা।

টমাস লণ্ঠন জ্বাললেন। আমরা কেবিনে ঢুকলাম। একটা বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে সরাসরি তাকালেন আমার পানে। 'রাম চলবে? সে-বার মানা করেছিলে।'

'কিন্তু এখন নেবো,' বললাম, 'বল ফিরিয়ে আনতে হবে।'

'তোমার শরীর ঠিকই আছে, আজ রাতে আলোচনাসূচি অন্য।'

থামলেন তিনি, রামে চুমুক দিলেন, তারপর গ্লাস নামিয়ে রেখে তাকালেন রান্নার দিকে। 'ওকে দেখছো?'

'কাকে, রেবেকাকে?' আমি বললাম।

'আরে না, জাহাজের কথা বলছি। দিনে দেখেছো?'

'দেখেছি।'

'আবার ভাসানো যাবে?'

'যাবে, আর না গেলে হাতের-পাঁচ জ্যাক আছে।'

'কী?'

'জলি জ্যাক দখল করবো আমরা। সুন্দর জাহাজ, ভারি অস্ত্রও রয়েছে।'

'খুব সহজ হবে না সেটা, তাছাড়া বিপজ্জনক,' একটু বাদে বললেন তিনি। 'তার চেয়ে বরং চলো টাইগারের অবস্থা কী দেখি।'

আমার ঘুম দরকার, কথাটা ওঁকে জানাতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি

হলেন তিনি। আমি একটা সেটীতে শুয়ে পড়লে ডেকে চলে গেলেন। টাইগারকে রক্ষা করা সম্ভব হলে উনি যে তাই করবেন তাতে সন্দেহ নেই।

নদীর উজানে যাবার সময় দূরে, বহুদূরে নীল পর্বতমালা আবছা আবছা চোখে পড়েছে আমার। এখন ঘুমের মধ্যে ওগুলো স্বপ্ন দেখলাম। ওই পর্বতমালা আমাকে হাতছানি দিচ্ছে, কেন জানি না। আবার যখন ঘুম ভাঙলো, বেলা চড়ে গেছে। হ্যাম রান্নার গন্ধ পাচ্ছি, গ্যালিতে লোকজন চলাচলের আওয়াজ ভেসে আসছে।

কয়েকমিনিট চুপচাপ পড়ে রইলাম গতরাতের স্বপ্ন এখনো আচ্ছন্ন করে আছে আমার মন। একদিন, যেভাবেই হোক, ওই পাহাড়ে যেতে হবে আমাকে। ওদের ট্রেইলে হাঁটতে হবে, চিনতে হবে দেশটা। আমার মানসপটে ইংল্যানডের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে এসেছে, পরিচিত লোকদের মুখও মনে করতে কষ্ট হচ্ছে। উঠে বসে বুটজোড়া গলিয়ে নিলাম পায়ে, তারপর তলোয়ারখানা ঝুলিয়ে দিয়ে স্টার্ন লাইটের ভেতর দিয়ে উঁকি দিলাম।

ঢেউ রয়েছে, তবে উথালপাথাল নয়। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। ডেকে বেরিয়ে আসতে সবার আগে জুবলেন সুপ্রভাত জানালো।

'টমাস বললেন তুমি নাকি জলি জ্যাক দখলের পরিকল্পনা করেছো?'

'প্রয়োজন হলে।' সামনের বালিয়াড়ি বন এবং বালুপাহাড়ের দিকে তাকালাম আমি। নড়ছে না কিছু

'জ্যাকের মাল্লারা সব খুনে-বদমাশ। লড়তে জানে।'

'ওদের অধিকাংশকে ডাঙায় নামিয়ে আনতে হবে আগে,' বললাম।

রেইল টপকে ডেকে এলেন টমাস। 'ভাসানো যাবে,' বললেন, 'ফুটোফাটা বন্ধ করা কঠিন হবে না, তবে সময় নেবে।'

ক্যাপটেনের হাতে লবণ লেগে রয়েছে, ঝাড়া দিয়ে সাফ করলেন। 'দেশটা কেমন, ওসমান? ভালো জমি আছে?'

'প্রচুর। শিকারও পাওয়া যায়, র‍্যানচের জন্যে আদর্শ জায়গা। ক্যাপটেন'—হাত দিয়ে চারপাশ দেখালাম—'যে-কেউ ইচ্ছে করলে ধনী হতে পারবে এখানে।'

'ইনডিয়ানদের সামলাবে কেমন করে?'

'ওরা বেশির ভাগ আত্মকলহে লিপ্ত, নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে। ফলে সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখা যাবে না। ওদের জীবনযাত্রা ভিন্ন, আমাদের মতো নয়, হিশেব করে ধৈর্য ধরে বুঝতে হবে সেটা। তবে একটা স্টকেড আর কয়েকটা কামান থাকলে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব।

কেবিনের টেবিলে খাবার সার্ভ করা হলে আমি খেতে বসলাম। আবার নতুন করে দুশ্চিন্তা ভর করলো মনে, গ্যারি লিনেকার এখনো বেঁচে আছে।

আমাদের একটা ফোরমাসট দরকার। জুবলেন করনিভো সাকিম এবং টমাসের কয়েকজন মাল্লাকে নিয়ে কাঠ আনতে বনে গেলাম। ওরা যখন গাছ কাটতে ব্যস্ত, আমি ঘুরে ঘুরে জায়গাটা ভালো করে চিনে রাখলাম—ভবিষ্যতে এটা একটা ট্রেড স্টেশনে পরিণত হতে পারে।

স্টেশনটা নদীতীরেই গড়ে তুলতে হবে। এ-সব জায়গায় সহজেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। উৎকৃষ্ট কাঠও মেলে। কাছে-পিঠে ঝরনা থাকলে তো সোনায় সোহাগা।

নদীর ভাটিতে গাছটা ভাসিয়ে দিলাম আমরা, টেনে নিয়ে গেলাম জাহাজের কাছে। সব কিছুই ভালোভাবে চলছে, লিনেকার বা তার

দলের কারো টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না।

চারপাশে গর্ত খুঁড়ে দড়ি খুঁটি ইত্যাদির সাহায্যে সোজা করা হয়েছে জাহাজটাকে। লিনেকারের মতলব আমরা সবাই জানি। শুধু লুটপাট করেই ক্ষান্ত হবে না, আমাদের খুন করতে চায়।

ছটো সুইভেল গান স্টার্নে সরিয়ে নেয়া হয়েছে, শত্রু জলপথে এলে শায়েস্তা করা যাবে।

চারদিনের অমানুষিক পরিশ্রমে জাহাজটা আবার যাত্রার উপযুক্ত হলো। জোয়ার এলেই রওনা হতে পারবো, তবে আমার ধারণা লিনেকারও এই আশাতেই অপেক্ষা করছে।

কেবিনে আমাদের সঙ্গে বসে আছে জুবলেন। আমাদের কথায় মুখ বাঁকা করলো সে। বললো : 'লিনেকার জোয়ারের কথা জানে, আমরা যা যা জানি সেও জানে। লোকটা বোকা নয়। এখন পর্যন্ত কিছু করেনি কেন বুঝতে পারছো না?'

'গতবারে আমরা উচিত শিক্ষা দিয়েছি, বলে,' জবাব দিলো কর-নিভো।

বিরক্তি চেপে রাখার চেষ্টা করলো না জুবলেন। 'ইচ্ছে করেই তোমাদের মেরামতের সুযোগ দিয়েছে সে,' বললো ও। 'চড়ায় আটকে-পড়া জাহাজ দিয়ে কী করবে, ওর দরকার চালু জিনিস।'

ডেকে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকালাম আমি। কালো মেঘের দল ভারি হয়ে উঠছে, বাতাস বইছে, তিরপলের একটা কোনা উড়ছে অল্প অল্প। বড় বড় ফোঁটায় একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল।

ঝড় আসছে, কিন্তু এলেও উপায় নেই—জোয়ারের সুযোগটা নিতে হবে, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবো আমরা। ব্রায়ান টমাস ডেকে বেরিয়ে এসে আকাশটা দেখলেন একনজর,

তারপর মাল্লাদের ডেকে অবশিষ্ট যন্ত্রপাতি তাড়াতাড়ি জাহাজে তুলে ফেলতে নির্দেশ দিলেন।

'ঝড়ের সময়,' আমি বললাম, 'বোধ হয় কেটে পড়তে পারবো আমরা।'

'তাই,' বললেন টমাস।

রেবেকা ডেকে এলো। বাতাসে ওর স্কার্ট হাঁটুর কাছে উড়ছে। 'অ্যালান ওসমান,' বললো সে। 'সুন্দর নাম।'

'মানুষের নাম হয় তার কাজে,' আমি বললাম। 'আমার বাবা নিজের নামটাকে সফল করেছিলেন, আমিও সে-চেষ্টা করছি। যুগ পালটে যাচ্ছে, সবাই এখন আরেকটু ভালো থাকার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে। অথচ দেশে সেটা সম্ভব নয়, অভিজাত সম্প্রদায় সব সুযোগ কবজা করে রেখেছে।' হাত নেড়ে ইশারা করলাম। 'কিন্তু এখানে তেমন কোনো বাধা নেই।'

'হয়তো। তবে লোকসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে সেই এক অবস্থাই হবে।'

আমি হাসলাম। 'সে-জন্যেই তো আগে এসে এমন আইন তৈরি করতে হবে যাতে পরে অসুবিধে না হয়।'

'ওটা রাজার দায়িত্ব,' ও প্রতিবাদ জানালো।

'তাই। তবে রাজা বহুদূরে রয়েছেন, এবং তাঁর বাণী জায়গামত পৌঁছুতে সময় নেয়। তাছাড়া মানুষ নিজেদের সুবিধেমত নিয়ম-কানুন গড়ে নেয়। এখানে রাজদরবার নেই, অতএব কোনো অমাত্যেরও প্রয়োজন নেই। দরকার শক্তি সাহস বুদ্ধি—আর এগুলো তুমি কারিগর শিল্পী, এদের মাঝেই বেশি দেখতে পাবে।'

'তোমার ভালো লাগে এই জায়গা,' ডাঙার দিকে ইশারা করলো

সে।

আমার দৃষ্টি উপকুলরেখা ঘুরে এলো, এই কালো মেঘের মাঝেও সবুজ সুন্দর। 'লাগে। চমৎকার দেশ, সব কিছু রয়েছে। আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু আবার ফিরে আসবো।'

অপলক দৃষ্টিতে ও অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো আমার দিকে, তারপর কী বললো শুনতে পেলাম না। ইতিমধ্যে ক্যাপটেন টমাস কমপ্যানিয়নওয়ে থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার জুড়েছেন, 'স্ট্যানড বাই, ফোর-অ্যানড-অ্যাফট। দ্য টাইড ইজ কামিং ইন।'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই একটা বড় ঢেউ জাহাজ অতিক্রম করে চলে গেল, সেই সাথে ধুয়ে গেল কিছু বালু।

'ওই আসছে।' চেঁচিয়ে উঠলো জুবলেন।

জলি জ্যাক, তরতর করে এগিয়ে আসছে আমাদের পানে।

ষোলো

এখনো বেশ দূরে রয়েছে জ্যাক, বাতাসও তার প্রতিকূলে—তবে সে যে আমাদের আক্রমণ করতেই আসছে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। মহাসঙ্কটে পড়লাম আমরা, চড়ায় আটকে আছি, কয়েকটা হালকা কামান ছাড়া, পাল্লা দেয়ার মতো কিছু নেই।

এখন আমাকে তৎপরতা দেখাতে হয়, ভাবলাম, কোনো রকম

চিন্তাভাবনা না করে নেমে পড়লাম মাঠে—ক্যাপটেন টমাসের সাথেও আলাপের প্রয়োজন বোধ করলাম না।

'সাকিম। জুবলেন। করনিভো। এসো আমার সঙ্গে।' পাশ দিয়ে একজন মাল্লা হেঁটে যাচ্ছিল, ওকে সুইভেল গানের দিকে ঠেলে দিলাম। 'একটা স্লিং বেঁধে দাও। জলদি।'

সাকিম ছুটে আসতেই ওকে ডিঙি নিয়ে তৈরি থাকতে বললাম। দৌড়ে কেবিনে গিয়ে আমার বড় ধনুকটা আর কিছু তীর নিয়ে এলাম।

ডেক থেকে ওরা হালকা অথচ শক্তিশালী কামানটা নামিয়ে দিলো, আমরা ওটা জায়গামত বসালাম। ডিঙিটা হালকা, দ্রুত ছুটতে পারে—কিন্তু কামানের ভারে একপাশে কাত হয়ে গেল। উলটো দিকে কিছু ভারি জিনিস চাপিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যবস্থা করলাম আমরা। তারপর পাল খাটিয়ে রওনা হলাম খোলা খাঁড়ির উদ্দেশে: এই অপারেশনে প্রশস্ত জায়গার দরকার।

জোয়ারের জল বেড়ে উঠছে দ্রুত, তবে টাইগারের মতো একটা জাহাজকে ভাসাতে আরো সময় লাগবে। আমি পেছন ফিরে দেখলাম, অ্যাসটার্নের দিকে দড়ি বেঁধে একটা বোট নামিয়ে দিয়েছেন টমাস, বোটের মাল্লারা গুণ টেনে জাহাজটাকে জলে নামাবার চেষ্টা করছে।

জলি জ্যাক আমাদের ডিঙিটা দেখে থাকলেও আমল দিলো না। ওদের একমাত্র লক্ষ্য টাইগার, এবং চড়া থেকে মুক্ত করে আনার পরিশ্রমটুকু আমাদের দিয়েই করিয়ে নিতে চায়। উপকূলের দিকে সরে যাচ্ছে ও, পথ আগলে রেখে আত্মসমর্পণ করতে বলবে টাইগারকে, এবং রাজি না হলে কামান দাগবে।

আমরা এ-বার ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে জ্যাকের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার উদ্দেশ্য সমস্যার সৃষ্টি করে টাইগারকে চড়া থেকে বেরিয়ে

আসার জন্যে খানিকটা সময় পাইয়ে দেয়া। যা করতে যাচ্ছি সেটা চরম নির্বুদ্ধিতা, সাফল্যের বারোআনাই নির্ভর করছে ডিঙির ভার-সাম্যের ওপর—অথচ কামান বহন করতে গিয়ে সেটা অনেকটাই হারাতে হয়েছে।

জ্যাকের কাছাকাছি চলে গেলাম আমরা, পাত্তা দিলো না সে। ফোরমাসট লক্ষ্য করে কামান দাগলাম।

থরথর করে কেঁপে উঠলো ডিঙি, জাহাজের ডেকে শোরগোল পড়ে গেল, তারপর হেঁড়ে গলায় সরে যাবার নির্দেশ দিলো একজন।

মাস্তলের কোনো ক্ষতি করতে পারিনি, তবে সামনের বুলওঅর্কটা উড়ে গেছে। আবার কামান লোড করলাম। সাকুল্যে আটটা গোলা এবং সামান্য কিছু পাউডার সঙ্গে নিয়ে এসেছি আমরা।

এ-বার ওরা পোর্টহোলের ভেতর দিয়ে আমাদের দিকে একটা কামান তাক করলো। হাঁটু গেড়ে বসলাম আমি, বড় ধনুকটার সাহায্যে খোলা পোর্টে একটা তীর ঢুকিয়ে দিলাম। এতে ওরা হকচকিয়ে গেলেও কোনো রকম ক্ষতি সাধন করতে পেরেছি বলে মনে হলো না।

ডানে ঘুরে দ্বিতীয় গোলাটা ছুঁড়লাম, হুইলের ঠিক পেছনে আফ্‌-টার হাউসের ছাত উড়ে গেল। প্রায় একই সময় জ্যাকের কামান গর্জে উঠলো, আমাদের পেছনে কয়েক ফুট দূরে গিয়ে পানিতে পড়লো গোলাটা। ওরা আরেকবার চেষ্টা করার আগেই আমরা স্টার্নের তলা দিয়ে পোর্টসাইডে বেরিয়ে এলাম, জাহাজের প্রায় কোল ঘেঁষে থাকায় কামানের আওতায় পড়লাম না।

হালকা অস্ত্র নিয়ে রেইলে ছুটে এলো লোকজন। পিস্তলের গুলিতে একটাকে নিকেশ করলো জুবলেন। ডিঙির ওপরে জাহাজ তুলে দেয়ার চেষ্টা করলো ওরা, কিন্তু ব্যাপারটা আগেই আঁচ করতে পেরে সাকিম

বাঁয়ে কেটে পিছিয়ে গেল।

একজন দৌড়ে অ্যাফটে এসে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়লো, আচমকা কামানের শব্দে তালা লেগে গেল কানে। টাইগারের স্টার্নের একটা কামান থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, দেখলাম আমরা। তারপর আরেকটা গর্জে উঠঁলো।

টাইগারের প্রচেষ্টা কতটুকু কার্যকর হয়েছে বুঝতে পারলাম না, তবে জ্যাকের স্টার্নে যে-কামানগুলো বসানো আছে সেগুলোর নাগাল থেকে বাইরে থাকার জন্যে কাছে সরে এলো। মাসকেট নিয়ে অ্যাফটে এলো লিনেকারের মাল্লারা।

প্রথমজনকে তীর মেরে ঘায়েল করলাম আমি, দ্বিতীয়টা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, তারপর সহসা নিজেকে অভিসম্পাত দিলাম।

সাকিম পেছন ফিরে তাকালো আমার দিকে। 'কী হলো?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'সাকিম, আমরা কী বোকা! সোজা জিনিসটা লক্ষ্য করিনি।'

দুজনেই তাকালো এইবার।

'রাডার,' আমি বললাম, 'পয়েনট-ব্ল্যাংক রেনজ। গুঁড়িয়ে দাও ওটা।'

জুবলেন তখন কামানে গোলা ভরা শেষ করেছে। 'ঠিক আছে,' বললো সে, 'সময় হলে বলবে।'

'জাহাজের কাছে সরে যাও, সাকিম।' একটা তীর জুড়ে ধনুকটা বাগিয়ে ধরলাম আমি।

জলি জ্যাক ঘুরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, স্টারবোর্ডের কামানগুলো দিয়ে টাইগারকে ঘায়েলের পাঁয়তারা করছে।

যতটা পারা যায় এগিয়ে গেলাম আমরা। জুবলেন জ্বলন্ত দিয়া-

শলাইয়ের কাঠি নলের ভেতর ফেলে দিলো। মৃত্যুপুরীর নীরবতা যেন ঘিরে ধরলো আমাদের, তারপর সহসা থরথর করে কেঁপে উঠলো ডিঙিটা।

তুসেরি গোলার আঘাতে চুরমার হয়ে গেল রাডার পোসট। ঝটপট আবার গোলা ভরলো জুবলেন। লোকটার কাজকর্ম সত্যিই তাকিয়ে দেখার মতো, একজন দক্ষ গোলন্দাজের মতো নিপুণভাবে সব কিছু করছে—কোথাও এতটুকু জড়তা নেই। আবার বারুদ উদ্‌গীরণ করলো কামান, অসহায়ভাবে ঝুলতে লাগলো রাডারটা। পিছিয়ে পড়তে শুরু করলো জলি জ্যাক।

সাকিম ইতিমধ্যে ডিঙি ঘোরাতে শুরু করেছে। এক মুহূর্তের জন্যে, জাহাজের কাছাকাছি থাকার সময়, বাতাস পড়ে গেল। তারপর আবার পাল ফুলে উঠলো, জলি জ্যাকের ছায়া থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। তুটো গোলা এসে আছড়ে পড়লো ডিঙির অনতিদূরে, একটার আঘাতে গানলের ছালবাকলা সামান্য উঠে গেল, কিন্তু আমাদের কোনো চোট লাগলো না।

জলি জ্যাকের ব্রডসাইড কূলের দিকে ঘুরে গেছে, পেছনে তাকিয়ে দেখলাম আমি, তুজন মাল্লা তাড়াহুড়ো করে পাল গুটিয়ে ফেলছে, অন্যরা একটা অস্থায়ী রাডার টাঙাবার চেষ্টা করছে স্টার্নে।

ওদিকে টাইগারের চড়াজীবন শেষ হয়েছে, মাল্লারা গুণ টেনে আবার গভীর জলে নিয়ে গেছে তাকে। তুবার কামান দাগলো টাইগার, তুটোই জ্যাকের মাস্তুলে আঘাত হানলো: একটা ইয়ার্ড খসে পড়লো ডেকে পালে হাওয়া পেয়ে গতি বেড়ে গেল টাইগারের। গুণ খুলে নিয়ে লংবোটের মাল্লারা জাহাজে ওঠার জন্যে পিছিয়ে গেল।

আরো খানিকটা দূরে সরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা, দৃষ্টি জ্যাকের দিকে নিবদ্ধ। লিনেকার ঝানু নাবিক। স্বীকার করতে বাধ্য হলাম আমি জাহাজের গতিপথ ঠিক রাখার জন্যে সে পাল ব্যবহার করছে, প্রাণপণে খাটছে তার মাল্লারা টাইগার আমাদের কাছে এগিয়ে এলো, একটা দড়ি ছুঁড়ে দিলো একজন খালাসী। সাকিম ডিঙিটা বাঁধলো ওটার সাথে করনিভো কামানের স্লিং ঝুলিয়ে নিলো গলায় অ্যাফটে আরেকটা দড়ি বেঁধে ডিঙিটা জাহাজের গায়ে ভেড়ালাম আমরা।

সবশেষে জাহাজে উঠলাম আমি, একমুহূর্ত দড়িতে ঝুলে থেকে ডাঙার পানে তাকালাম। দূরে, বহুদূরে গাঢ় সবুজ বন, সামনে পাণ্ডুর বালুপাহাড়ের গায়ে সবুজ গাছপালা, এবং তারপর নীল জলরাশি অপূর্ব দেশ ··অপূর্ব। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরতে বাধ্য হচ্ছি বলে আমার মন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম আমি, নিচে টোলাইনে বাঁধা অবস্থায় পড়ে রইলো ডিঙি কোয়ার্টারডেকে দাঁড়িয়ে আছেন টমাস, পাশে রেবেকা।

'নীট ওঅর্ক, ওসমান,' বললেন তিনি। 'ভেরি নীট ওঅর্ক।'

খোলা সাগরে বেরিয়ে আসার জন্যে উত্তরপূর্ব দিকে যাত্রা করলাম। আমাদের সাথে মিলিত হবার আগে উপকূল এলাকায় ব্যবসা করে এসেছেন টমাস, ভালো লাভ হয়েছে। আর আমার কাছে রয়েছে ফার ···আমার পরিশ্রমের তুলনায় যথেষ্ট, তবু আরো দরকার, নেবার মতো জায়গাও আছে এই জাহাজে।

'এখন কী করবে?' জুবলেন জিজ্ঞেস করলো।

'উত্তরে যাবো,' বললাম আমি। 'এবং সম্ভব হলে চেসাপীক বেতে

গিয়ে পটাশ আর মাস্তুলের কাঠ জোগাড় করবো।'

উপসাগরের তীরজুড়ে শালবন। জাহাজের মাস্তুলের জন্যে গাছ কাটা ছাড়াও চল্লিশ টন পটাশ সংগ্রহ করলাম আমরা। এবং সেই সাথে আশপাশের ইনডিয়ানদের সঙ্গে অল্পবিস্তর ব্যবসাও হলো।

ওদের সাথে কারবার করতে গিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো। আমার : ভীষণ চতুর; আসল-নকল সহজেই ধরে ফেলে, ভালো জিনিসের কদর করতে জানে। একটুতেই যেমন চটে যায় তেমনি সাহসের তারিফ করে। ইনডিয়ান জীবনধারা মূলত সাহসের ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে, তাই এটাকে ওরা সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দেয়। শিকার এবং যুদ্ধে সাহসের প্রয়োজন হয় তার; স্বগোত্রে সাফল্য অর্জনের জন্যে লাগে একই সঙ্গে সাহস আর চাতুর্য।

লিনেকারের নজরে যাতে আমাদের পড়তে না হয় তাই ছোট ছোট খাড়ি আর নদীর মোহানাতেই থাকছি। তবে, জানা কথা, ও আমাদের খুঁজবে। অস্ত্রশস্ত্রে, মাল্লায় ওর শক্তি আমাদের চেয়ে বেশি।

অবশেষে, আমাদের হোলড যখন ফার, পটাশ আর তক্তায় উপচে উঠলো, ইংল্যানডের পথে রওনা হলাম।

'আবার দেশে ফিরছি মনে হতেই ভালো লাগছে,' রাতে খেতে বসে বললো রেবেকা।

'হ্যাঁ,' দায়সারাভাবে সায় দিলাম। 'তবে আমি ফিরে আসবো।'

টমাস খাওয়া থামিয়ে তাকালেন আমার দিকে। 'ইংল্যানডে নিরাপদে ফিরতে পারলে,' বললেন, 'বেশ মোটা টাকা পাবে তুমি।'

'হ্যাঁ,' আমি একমত হলাম।

'এবং তোমার বন্ধুরা ওখানে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।'

'খুব সম্ভব,' সতর্কতার সঙ্গে বললাম, 'অবশ্যি আমার ওতে একটুও বিশ্বাস নেই। নিজের ভবিষ্যৎ মানুষকে তার নিজের হাতেই গড়তে হয়, এই সত্যটি আমি মানি। যেমন আমার ভবিষ্যৎ আমেরিকায়।'

'ওই দুর্গম দেশে গিয়ে অনেকেই আর ফিরতে পারেনি,' বললেন টমাস, 'সে-ক্ষেত্রে আমাদের ভাগ্য ভালোই বলতে হবে।'

পরবর্তী কয়েকটা রাত নানা বিষয়ে আলোচনা করে প্রায় নির্ঘুম কাটলো। ট্রেড পোসট, লনডনে কে ব্যবসা দেখাশোনা করবে, কোন ডক থেকে মাল খালাস হবে বা জাহাজে উঠবে—ইত্যাদি বহু ব্যাপারে কথা বললাম। শেষ-পর্যন্ত ঠিক হলো, লনডনে একজনকে দায়িত্বে রেখে আমি যাবো আমেরিকায়। আর টমাস দেখবেন পরিবহনের দিকটা। এইভাবে চললে অচিরেই আমরা যে একটা লাভজনক ব্যবসা দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারবো সে-বিষয় দ্বিমত রইলো না কারো

'লনডনে কে থাকবে?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন টমাস। 'দীর্ঘদিন বাইরে থাকার ফলে আমার তো তেমন একটা যোগাযোগ নেই লোকজনের সঙ্গে।'

'সে আমার ঠিক করাই আছে মনে মনে,' শান্ত গলায় বললাম। 'একটু দুর্জনপ্রকৃতির তবে সৎ। পিটার টালিস—ওর কথা বলেছি আগে।'

'তা বলেছো। বিশ্বাসী?'

'আমার তো তাই ধারণা। ওয়াদা করলে ও সেটা রাখবে বলেই মনে হয় চতুর লোক। ব্যবসা বোঝে, লোকের সঙ্গে জানাশোনাও প্রচুর। লনডনে কখন কী ঘটছে খবর রাখে। এর চেয়ে ভালো লোক পাওয়া মুশকিল।'

'ঠিক আছে, ওর সঙ্গে তাহলে কথা বলবে তুমি।'

ব্যবসা সম্পর্কিত মোটামুটি সব কথাবার্তাই পাকা হলো। জুবলেন আর করনিভোর শেয়ার ধার্য করা হলো।

অবশেষে, টেমস নদীতে ঢুকলাম আমরা। তীরে হাজার আলোর মেলা দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেল, বিশ্বাসই হতে চায় না যে এত আলোও থাকতে পারে কোনো জায়গায়।

সহসা আমার হাত খামচে ধরলো জুবলেন। 'অ্যালান···দ্যাখো!'

ওর ইশারা লক্ষ্য করে চমকে উঠলাম আমি, হিমশীতল ভয়ের অনুভূতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো সারা শরীরে।

জলি জ্যাক— দেখে মনে হচ্ছে হপ্তাখানেক আগে পৌঁছেছে।

অর্থাৎ রুপার্ট গেনেসটার ওত পেতে আছে আমার জন্যে।

সতেরো

আমাদের পাড়ে নিয়ে যাবার জন্যে খেয়ামাঝিরা এসে হাঁকডাক শুরু করলো। কিন্তু টমাস ওদের কাউকেই নিলেন না। 'এদের বিশ্বাস করা কঠিন। ভালো লোক আছে, তবে বেশির ভাগই চোর-ছ্যাঁচড়। কাজেই ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। আমরা নিজেদের বোটে করে যাবো।'

আমার পানে তাকালেন তিনি। 'সাবধানে থেকো। আমি এই অভিযান সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে যাচ্ছি। পরবর্তী যাত্রার প্ল্যানও করবো।'

'করনিভো যাবে পিটার টালিসের কাছে,' বললাম। 'আমি ট্যাবার্ডে গিয়ে হ্যাসলিংকে খবর পাঠাবো। টালিস দেশের হালচাল যদি নাও জানে তো হ্যাসলিং নিশ্চয়ই জানবেন।'

আমরা নিজেদের বোট নিয়ে যাচ্ছি দেখে খেয়াওয়ালারা ঝেড়ে গালমন্দ দিলো আমাদের, তারপর অন্য সওয়ারি ধরার আশায় হাওয়া হয়ে গেল। কেবল একটা নৌকো আঠার মতো লেগে রইলো পেছনে, মনে হলো অনুসরণ করছে।

'হ্যাঁ,' মুখ কালো করে সায় দিলো জুবলেন, 'আবার ঝামেলায় জড়াতে যাচ্ছি আমরা।'

ইংল্যানডের মাটিতে নেমে টমাস আর রেবেকা নিজেদের বাসায় চলে গেল, এবং আমি বন্ধুকে নিয়ে ট্যাবার্ডে রওনা হলাম। গেনেস-টারের ভয়ে এতটুকু বিচলিত বোধ করছি না, সাফল্য আমার সাহস শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

অন্ধকার সরু গলিপথ ধরে হাঁটছি আমরা। আশপাশের বাড়িঘরের জঞ্জাল রাস্তার এখানে-সেখানে স্তূপ হয়ে আছে। পায়ের কাছ দিয়ে একটা ইঁদুর দৌড়ে গেল। মনে হলো সব ভৌতিক ছায়া পিছু নিয়েছে আমাদের।

জুবলেন আরো কাছে সরে এলো। 'আমার কিন্তু গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না, অ্যালান। নাকে মৃত্যুর দুর্গন্ধ পাচ্ছি।'

'তবে আমাদের নয়,' শান্ত গলায় জবাব দিলাম। 'আজ রাতে মৃত্যু হলে অন্য কারো হবে।'

'তাই যেন হয়,' শুকনো গলায় মন্তব্য করলো সে।

আমার হাত রইলো তলোয়ারের বাঁটে, জুবলেনের বাঁ হাতে খোলা ভোজালি, ডান হাতে ধরে আছে তলোয়ারের বাঁট। কোনো অঘটন

ঘটলো না। অন্ধকার থেকে একটা অপেক্ষাকৃত আলোকিত চওড়া গলিতে বেরিয়ে এলাম আমরা। হাঁফ ছেড়ে ভোজালিটা খাপে পুরলো জুবলেন।

পেছনে তাকিয়ে সহসা আমার চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়লো, সাঁত করে একটা ছায়ামূর্তি সরে গেল অন্ধকার গলিতে। ব্যাপারটা হয়তো কিছু নয়, তবু খুঁতখুঁত করতে লাগলো মন। আমিও, জুবলেনের মতোই, মৃত্যুর গন্ধ পাচ্ছি।

আলো ঝলমল করছে ট্যাবার্ডে, সরাইখানার উঠোনটা ঘরের বাতিতে আলোকিত হয়ে আছে। ভেতরে ঢুকে কোণের একটা টেবিল দখল করলাম। আজ রাতে দামী মদে আমার পোষাবে না, জগভর্তি চোলাই দরকার, অন্ধকার রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে গলা শুকিয়ে গেছে।

বেয়ারা চোলাই নিয়ে এলো। ওকে এক শিলিং বকশিস দিয়ে খাবার আনতে বললাম। আরো বকশিসের লোভে পুরু করে কয়েক টুকরো হ্যাম, রুটি আর বড় বড় আপেল দিয়ে গেল সে।

আগের যাত্রায় একজন মোটাসোটা গোলপনা পরিচারিকার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, জুবলেনের প্রতি নজর পড়েছিল ওর। আমাদের টেবিলের কাছে এলো সে। 'চিঠি আছে,' ফিসফিস করে বললো। 'পরশু দিয়ে গেছেন একজন। তোমরা বসো, আমি নিয়ে আসছি।'

কাজের ছলে কথাগুলো বলে চলে গেল সে। 'মেয়েটা ভালো।' জুবলেনের দিকে চেয়ে হাসলাম আমি।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের গ্লাসের দিকে তাকালো ও। 'হ্যাঁ,' একটু বাদে বললো। 'বাজারে মেয়েছেলেদের আমি চিনি। বেশির ভাগই মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে গাঁট কাটে, কিন্তু একে তেমন মনে হচ্ছে না।'

'তাহলে তো আমাকে নতুন সঙ্গী খুঁজতে হয়,' হাসতে হাসতে বললাম। 'বুঝতে পারছি তোমার মনে ধরেছে ওকে।'

আমাদের লাগোয়া একটা টেবিলে একজন বিশালদেহী বাঁদর-মুখো লোক বসে রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে কতকাল চিরুনি পড়েনি চুলে, লাল ভ্রূ। ময়লা বেশভূষা। লোকটা আমাদের টেবিল ছাড়া সব দিকেই তাকাচ্ছে। কিন্তু আমার কেন জানি মনে হলো আসলে সে আমাদের কথায় আড়ি পাতছে।

'ও-দিকে চার হাতপেয়ে একটা কলসি বসে আছে,' চোলাইয়ের মগ তুলে নিতে নিতে বললাম আমি।

কৌতুকের ঝিলিক খেলে গেল জুবলেনের চোখে। লোকটার দিকে পেছন ফিরে বসে আছে ও। 'দেবো নাকি শেষ করে?'

'পরে, পরিস্থিতি বুঝতে দাও।'

গোলপনা মেয়েটা দুই জগ চোলাই নিয়ে ফিরে এলো আবার। টেবিলের শেষ-প্রান্তে ঝুঁকে দাঁড়ালো।

'মদের দাম চুকিয়ে দাও। আমার ওপর নজর রাখা হচ্ছে,' বললো সে।

আমি টাকা বের করে দিলাম, ও তুলে নেবার সময় একটা ভাঁজ-করা চিরকুট আলগোছে ফেলে দিলো টেবিলের ওপর। আমি কাজের ছুতোয় একহাতে ঢাকা দিলাম ওটা। ও বিদায় নেবার পরেও কিছুক্ষণ খাওয়াদাওয়া চালিয়ে গেলাম, মেয়েটাকে আমরা বিপদে ফেলতে চাই না।

তারপর কাগজটা না তুলেই টেবিলের ওপর মেলে ধরলাম আমি। পরিচিত হস্তাক্ষর। জোরে জোরে পড়তে শুরু করলাম:

তোমার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। আমাদের বন্ধু মৃত্যুশয্যায়। তোমাকে ধরতে পারলে হয়তো মেরে ফেলবে। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। একমাত্র যিনি সাহায্য করতে পারতেন তাঁকে গাঁয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাউকে দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না।

সি এইচ

'হুঁ, বেশ ঘোলা জল!' বললাম আমি।

'তাই,' বললো জুবলেন।

'চলো, এখান থেকে কেটে পড়ি।' আমি দ্রুত উঠে দাঁড়ালাম, ঠিক সেই মুহূর্তে একজন আমার হাত ধরে টানলো।

সেই পরিচারিকাটি। 'এই পথে,' বললো সে। 'সদর দরজা আগলে আছে ওরা।'

ওকে অনুসরণ করে ভিড় ঠেলে একটা অন্ধকার প্যাসেজে এলাম আমরা। পেছনের একটা ফাঁকা মাঠে গিয়ে পড়েছে ওটা। একটা আধো-অন্ধকার গলি দেখিয়ে ফিসফিস করে মেয়েটা বললো, 'এই পথে গেলে নদী পড়বে।'

দ্রুত হাঁটতে লাগলাম আমরা। জেলের ভাত খাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই, বহুলোক অকারণে বছরের পর বছর ঘানি টানছে ওখানে।

গলিটা ঢালু হয়ে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে শেষ হয়েছে। ওখান থেকে নদী খুব বেশি দূরে নয়। রীড ঝোপের ভেতর দিয়ে আমরা একটা পরিত্যক্ত ডকে এসে হাজির হলাম। জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেছে, ফাটলের ভেতর দিয়ে কালো জল দেখা যাচ্ছে। ঘাটে

কোনো নৌকো নেই। আগাছায় ভরে উঠেছে জায়গাটা, পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী—অন্ধকার, রহস্যময়।

আমাদের বহু পেছনে সরাইখানার খিড়কি দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। এক টিলতে আলো এসে পড়লো বাইরে। 'এটাই একমাত্র রাস্তা।' হেঁড়ে গলায় বললো কেউ। 'ওরা নদীর দিকে গেছে।'

'ননসেনস।' কর্তৃত্বের সুর ফুটলো দ্বিতীয় গলায়। 'ও-দিকে গেলে টেমসে সাঁতার কাটা ছাড়া ওদের উপায় নেই।'

কিন্তু লোকটা জানে না রাস্তা একটা আছে, এবং ওটাই বেছে নিলাম আমরা।

ডকের সিঁড়ি বেয়ে বাঁধের ওপর উঠে গেলাম। সরু খাড়া দেয়াল, কর্দমপিচ্ছিল। ওই দেয়ালের ওপর দিয়ে হাঁটতে বেড়ালও বোধ হয় ভয় পাবে। পাখির ডানার মতো করে হাত দুপাশে মেলে দিয়ে সাবধানে দেয়াল ধরে এগিয়ে গেলাম আমরা। কিছুক্ষণ পর একটা রাস্তা পেয়ে নেমে গেলাম।

হাতে হাত ধরে গল্প করতে করতে হাঁটছি, এ-মুহূর্তে কেউ দেখে কল্পনাও করতে পারবে না যে আমরা ফেরারী আসামী, একটু আগে রানীর পেয়াদাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

'দাঁড়াও, জুবলেন। ফেউ লেগেছে মনে হচ্ছে।'

চারপাশে তাকালো সে। 'হ্যাঁ, তবে মোটে দুজন। দেবো নাকি, দোস্ত, নদীতে ফেলে? মা টেমস তো অতীতে এমন বহু বলি নিয়েছেন।'

'হাঁটতে থাকো। সামনেই বাতি দেখা যাচ্ছে, দুজন পথচারীকে সন্দেহের চোখে দেখবে না কেউ।'

'কিন্তু আমাদের বুটে কাদা লেগে রয়েছে যে।'

'লনডনে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে গেলে কাদা লাগতেই পারে। ওই যে একটা পানশালা দেখা যাচ্ছে।'

সস্তা পাব, কড়িবর্গাগুলো নিচু। মাথা ঠুকে যাবার ভয়ে ঈষৎ নুয়ে ঢুকলাম আমি। একটা লম্বা কাঠের টেবিলকে বার বানানো হয়েছে। বেশ কিছু বেনচি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কয়েকটা চেয়ার টেবিলও আছে। খদ্দেররা সব খালাসী, শ্রমিকশ্রেণীর লোক।

আমরা ভেতরে ঢোকামাত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো, কিছুই ওদের নজর এড়ালো না। কোণের একটা টেবিলে গিয়ে বসলাম। একটু আগে কেউ বসেছিল ওখানে, খালি জগটা এখনো পড়ে আছে। তলোয়ারটা আমি এমনভাবে রাখলাম যাতে ইচ্ছে করলেই বের করতে পারি। ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো ওরা।

ওদের একজন এগিয়ে এলো। ছিপছিপে গড়ন, এক চোখে কালো পট্টি বাঁধা। মাথায় একটা দোমড়ানো হ্যাট। কাপড়চোপড় সস্তা, নোংরা, কিন্তু চলাফেরায় ভারিক্কি চাল রয়েছে।

'দোস্ত, তলোয়ারে হাত রাখার দরকার নেই,' বললো সে। 'আমরা পাজি হতে পারি, কিন্তু নিজেদের আড্ডায় হাঙ্গামা করি না। যত ইচ্ছে খাও, গল্প করো। অনেক আষাঢ়ে কাহিনী শুনতে পাবে এখানে, কে কটা রাজা-উজির মারলো। সব স্বপ্ন, আসলে আমাদের করার মতো তেমন কিছুই নেই।'

'ইচ্ছে করলেই মানুষ বড় হতে পারে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।'

'তাই বুঝি। হতে পারে, তাহলে আমারও বোধ হয় একটা আশা আছে।' জুবলেনের দিকে তাকালো সে। ওদের দুজনের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। আমার ব্যাপারে লোকটা এখনো

অনিশ্চয়তায় ভুগছে : আচার-আচরণ ভদ্রজনোচিত। অথচ জুতোয় কাদা। ছুট করে রাতের বেলায় শহরের একটা অখ্যাত জায়গায় এসে উদয় হয়েছি। 'তোমাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। কথাবার্তায় মনে হচ্ছে শিক্ষিত, অথচ,' চিন্তিত সুরে বললো সে, 'এমন পোড়-খাওয়া চেহারা কোনো শিক্ষিত লোকের হবার কথা নয়। ওই ছাপ আমি চিনি, এই ম্লান আলোতেও তোমার চেহারায় সমুদ্রের ছোবল স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

লোকটা এ-বার হাসতে লাগলো। চোখদুটোতে চাপা কৌতুক খেলা করছে। 'অন্ধকার কর্দমাক্ত রাস্তা দিয়ে কারা এলো, না দুজন জাহাজি যাদের গায়ে এখনো কালাপানির গন্ধ লেগে রয়েছে। আজ সন্ধ্যেয় টাইগার নামে একটা জাহাজ ভিড়েছে ঘাটে, আমেরিকা থেকে ফিরছে। রানীর পেয়াদা ওই জাহাজের দুজন লোককে খুঁজছে...'

'যে-কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে ওরা,' অকপটে বললাম আমি।

'এসো, টুপি অদলবদল করি,' বললো সে। 'আমারটা একটু টাইট হবে তোমার মাথায়, তবু চলবে আপাতত। কই, তাড়াতাড়ি করো।'

তাই করলাম আমরা। ওরটা পুরোনো, বহু ব্যবহৃত। পালকগুলো ভাঙা। তবু এক ধরনের আমেজ পেলাম। আমার টুপিটা পরলো সে, তারপর পেছন ফিরে বললো, 'মেজর স্যালি। চার জগ।'

হাসি হাসি মুখে চারপাশে তাকালো লোকটা। 'আমার নাম জেরেমি রিং। এক সময় রাজকীয় নৌবহরের অফিসার ছিলাম, তারপর বারবারিতে বন্দী অবস্থায় কাটিয়েছি কিছু দিন। এখন ভব-

ঘুরে, পিছুটান নেই।'

হঠাৎ খুলে গেল দরজা, দুজন লোক এসে দাঁড়ালো দোরগোড়ায়। একজন শক্তপোক্ত, দেখলেই বোঝা যায় সৈনিক। অন্যজন একটু বেঁটে, গ্রাম্য চেহারা—বন্দুকের পরিবর্তে ওর হাতে হেফর্ক থাকলেই যেন মানাতো বেশি।

একে একে সবার ওপর নজর বুলিয়ে আমাদের কাছে এসে স্থির হলো ওদের দৃষ্টি। ঠিক এই সময় চার জগ চোলাই নিয়ে এলো স্যালি। শক্তপোক্ত লোকটা প্রথমে নতুন জগ তারপর খালি জগটার দিকে তাকালো।

আমি কুঁজো হয়ে বসে আছি যাতে বেঁটে দেখায়, তাছাড়া জেরেমি রিংয়ের টুপিটাও আমার চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন এনে দিয়েছে। রিংয়ের দিকে তাকাতেই আমার নিজের টুপিটার প্রতি ওর দৃষ্টি আটকে গেল। 'এই তুমি!' বললো সে। 'কখন থেকে আছো এখানে?'

'সাতাশ বছর ক্যাপটেন। বো বেলস-এর ঘন্টাধ্বনির মাঝে আমার জন্ম। সাতাশ বছর, তার মধ্যে সতেরো বছর কাজ করেছি হার ম্যাজেসটির নৌবহরে।'

'আরে আমি এই সরাইখানার কথা বলছি।'

'ও? তা এই মিনিট কয়েক। আমরা মাত্র ট্যাবার্ড থেকে আসছি। ওখানে ভিড় বেশি দেখে চলে এলাম। আসুন না, ক্যাপটেন, গলা ভিজিয়ে যান আমাদের সঙ্গে।'

'আমার সময় নেই। রানীর কাজে ব্যস্ত আছি।'

বিস্মিত হবার ভান করলো জেরেমি। 'রানীর কাজ! এই জায়গায়? ভাবতেই অবাক লাগছে আমার...'

'থামো তো, বাপু। দুজনের নামে হুলিয়া জারি হয়েছে। ওদের খুঁজতে এসেছি আমি।'

'মোটে দুজন? আটক করা উচিত এমন নাম আমি গণ্ডায় গণ্ডায় করতে পারি, ক্যাপটেন···'

'নাহ্, তুমি দেখছি আচ্ছা বাচাল।' চটে উঠলো লোকটা। 'তা তোমরা মাত্র ট্যাবার্ড থেকে এসেছো, না? খাটুনিটা তার মানে, রবার্ট, মাঠে মারা গেল। নিশ্চয়ই ভুল লোককে অনুসরণ করেছি আমরা।'

'কিন্তু ওই টুপিটা···'

'গুলি মারো তোমার টুপির! ও-রকম হাজারটা দেখা যায় রাস্তায়।' রাগত মুখে ঘুরে দাঁড়ালো ওরা, গটগট করে বেরিয়ে গেল।

জেরেমি রিং তাকালো আমার দিকে, দুগালে ভাঁজ পড়েছে। 'তো মদের দামটা তুমিই দিচ্ছো?'

'দেবো,' আমি বললাম, 'এবং খুশি মনে।'

'আগে সাবাড় করে নেই এটা,' বললো সে, 'তারপর কাছেই একটা বাসায় নিয়ে যাবো তোমাদের।'

'রাত কাটাবার মতো জায়গা পেলেই হবে।'

'এর বেশি আর কী-বা চাই? ওই বাসাটা এক জাহাজির বউয়ের। বহুদিন হলো জাহাজি বাইরে বাইরে আছে। দুবেলা খুদকুড়ো যাই হোক খেতে তো হবে। তাই ও খানিকটা অংশ ভাড়া দিয়েছে। লনডনে এমন আরো বাড়ি আছে। এই শহরে, সত্যি বলতে কি, জাহাজিদের বাড়িগুলোই যা একটু সাফ-সুতরো।'

'আমিও তাই শুনেছি।'

'ম্যাগি মানুষ হিশেবে ভালো। ওর কোন চাচা না ঠাকুর্দার কাছ

থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে বাড়িটা। একটু বেশি কথা বলে, তবে খদ্দেরদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলায় না। নাও, তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করো ওই লোকদুটো হয়তো আবার চড়াও হতে পারে এসে।'

ম্যাগিকে আমার বেশ শান্তশিষ্ট বুদ্ধিমতী বলে মনে হলো। আমাদের মুখের কাছে লণ্ঠন উঁচু করে ধরে নীল চোখজোড়া দিয়ে নিরীক্ষণ করলো কিছুক্ষণ, তারপর বললো, 'তোমরা জেরেমির বন্ধু হয়ে থাকলে আমারও বন্ধু।' ওর দৃষ্টি কিছুটা কঠিন হলো। 'এবং ওর বন্ধু বলেই ভাড়া অগ্রিম দিতে হবে। ওর কাছে এমনিতেই অনেক টাকা পাওনা আছে আমার। ভাড়া তো দেয়ই না আবার খেয়েও যায় বিনে পয়সায়।'

'কত দিতে হবে?'

'এক বিছানায় শুলে ছপেনি, দুটো নিলে বারো। আর কয়েকটা আছে এক সাথে চার-পাঁচজন থাকা যায়। ওগুলো মাথাপিছু ছপেনি।'

'দুটো বিছানা,' বললাম আমি, 'এবং সকালে নাস্তা চাই।'

একটা শিলিং দিলাম ওকে। 'এইটে রাখো,' বললাম। 'আদর-যত্ন ভালো হলে আরেকটা দেবো।'

'চলো, তোমাদের ঘর দেখিয়ে দিই,' এক গাল হাসি হেসে বললো ম্যাগি।

ঘরগুলো ছোট কিন্তু অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ও বিদায় নেবার উদ্‌যোগ করতে আমি বাধা দিলাম। 'জেরেমি রিংয়ের সাথে তোমার কদ্দিনের পরিচয়?

'অনেক কালের। খুব ভালো লোক,' সোজাসাপটা জবাব দিলো

ম্যাগি। 'সাহসী বুদ্ধিমান। এক সময় ঝানু নাবিক ছিলো, কিন্তু কপালের ফেরে দীর্ঘদিন বারবারিতে কয়েদ খাটতে হয়েছে। এখন আর বিশেষ কেউ চেনে না ওকে।'

'ওকে বোধ করি আমার দরকার হবে।' পকেট থেকে একটা গিনি বের করলাম। 'ওর ধার কত জানি না, তবে এটা রাখো…'

'শোধ হয়েও বাঁচবে।'

'সে-ক্ষেত্রে এখানে আরো কিছু দিন থাকবে ও।'

'তুমি খুব দিলখোলা মানুষ,' মৃদু সুরে ও বললো।

জামাকাপড় খুলে টানটান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম আমি। বেডকাভারটা টেনে নিলাম কাঁধ অবধি। জীবনে আর কখনো যদি নাও ঘুমোই, আজ ঘুমোতেই হবে।

চোখ বুঁজলাম, পরক্ষণেই আবার তাকালাম অন্ধকারের ভেতর। যেভাবে হোক বাবার পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাকে —রুপার্ট গেনেসটারের কবলে নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থায় ফেলে যাওয়া চলবে না।

আঠারো

খাইয়ে হিশেবে আমাদের ওসমান পরিবারের খ্যাতি আছে, আমিও কোনো অংশে কম নই। তাই যখন সময় এলো, ম্যাগির টেবিলে

বসে একটা প্রমাণ সাইজের রুটি, এবং প্রচুর বেকন আর পনির একাই সাবাড় করলাম।

জেরেমি রিং আর জুবলেনও বেশ তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে।

'ভদ্রলোক কোথায় আছেন আমাকে জানতে হবে,' বললাম। 'একটা কিছু করতে হবে ওঁর জন্যে।'

'অথচ লোকটাকে তুমি চেনো না,' অনুযোগের সুরে বললো জুবলেন। 'জীবনে কোনো দিন কথাটি পর্যন্ত বলোনি এমন একজনের জন্যে ফাঁদে পা দিতে চাচ্ছো।'

'আমার বাবা আর উনি পাশাপাশি যুদ্ধ করেছেন। বাবা ওঁর জন্যে প্রাণ দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলেন। আমি তাঁর চেয়ে কম করি কীভাবে?'

'ওটা একদম আলাদা ব্যাপার। দুজনে এক সাথে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ওটাই দস্তুর।'

'মানলাম। কিন্তু তাই বলে একজন মুমূর্ষু বিপদাপন্ন বৃদ্ধকে বাঁচাবার চেষ্টা করবো না? আমি যাবো, জুবলেন। তোমাদের কাউকে যেতে হবে না, বিশেষত ওখানে যখন আমি ছাড়া কেউ ঢুকতে পারবে না।'

'এটা একটা ফাঁদ, তুমি বোকামি করছো।'

'আমাদের, হাওড়ের লোকদের, এই একটা মস্ত দোষ, আমরা খুব প্রভুভক্ত। অনেকে আমাদের ভালোবাসে, কেউ কেউ বলে গেঁয়ো চাষা, আবার অনেকের কাছে রহস্যময় জীব; খুনে। কিন্তু তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। বেঈমানি জিনিসটা আমাদের মধ্যে পাবে না।'

'কথায় তোমার সঙ্গে পারবো না আগেও বলেছি,' বিরক্তির ঝাঁঝ

ফুটলো জুবলেনের গলায়। 'কিন্তু উনি কোথায় আছেন জানো না।'

'খুঁজে বের করবো। জেরেমি, আমার হয়ে কাজটা করে দেবে তুমি। করনিভোকে আমি পিটার টালিসের কাছে পাঠিয়েছি। ইতি-মধ্যে ও হয়তো হদিস বের করে ফেলেছে। না পারলেও পরোয়া নেই, আর কেউ না জানলেও কভেনি হ্যাসলিং যে জানেন এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লো রিং। 'চলি। আমার এক গাড়োয়ান বন্ধু দেশের বাড়িতে যাচ্ছে। ওর মারফত হ্যাসলিংকে খবর দেবো।'

পরবর্তী দুটো দিন ম্যাগির বাসাতেই শুয়ে বসিয়ে কাটিয়ে দিলাম। তৃতীয় দিন একটা নৌকো ওই বাড়ির লাগোয়া ঘাটে ভিড়লো। দুজন নামলো নৌকো থেকে। একজন করনিভো, অন্যজন হ্যাসলিং।

'উনি কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা বেনচিতে বসে পড়লেন হ্যাসলিং। 'এমনিতেই তুমি ঝামেলায় আছো, তার ওপর বৃদ্ধও অনেক দূরে চলে গেছেন। আমার মনে হয় না উইলটা করা আর সম্ভব হবে তাঁর পক্ষে।'

'চুলোয় যাক উইল। আমি চাই ভদ্রলোক জীবনের শেষ কটা দিন যেন নিরাপদে নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাতে পারেন। আমার যথেষ্ট রয়েছে, ওঁরটা না হলেও চলবে।'

হ্যাসলিং টেবিলের ওপর ঝুঁকে এলেন। 'উনি অসুখে পড়ামাত্র গেনেসটার এসে নিয়ে গেছে তাঁকে। যাবার সময় বলে গেছে, "চাচাকে সামুদ্রিক অঞ্চলে নিয়ে যাচ্ছি। খোলা হাওয়া লাগলে শরীরটা চাঙা হয়ে উঠবে।" লনডনে তো এ-জন্যে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেছে ওর নামে।'

'কোথায় নিয়ে গেছে?' শুধোলাম।

কাঁধ ঝাঁকালেন হ্যাসলিং। 'কেউ জানে না। জিজ্ঞেস করলে বলে, চাচার শরীরটা সেরে ওঠেনি এখনো, বিশ্রাম নিচ্ছেন, দেখা করার দরকারটা কী? রেসট, অ্যানড নো ভিজিটরস।'

' "নো ভিজিটরস?" '

টেবিলে তাল ঠুকলো করনিভো। 'হুঁহু। দুটো দিন সময় দাও, ঠিক বের করে ফেলবো কোথায় আছেন। লনডনে হেন খবর নেই যা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।'

'অসুস্থ মানুষ, নিশ্চয়ই টাঙা বা ওয়াগনে করে নেয়া হয়েছে। এমন কটা টাঙা আছে এই শহরে? কয়টার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে সে? সবগুলো নিশ্চয়ই ভালো নেই? একটু সময় দাও, বের করে...'

'দিলাম,' আমি বললাম। 'কিন্তু বেশি দেরি করো না।'

ও চলে গেলে কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন হ্যাসলিং। 'তোমার বন্ধুভাগ্য ভালো, অ্যালান।'

'ওরা ভালো লোক।' আমি সামনে ঝুঁকে বসলাম। 'আমাদের সাথে আমেরিকায় যাওয়া উচিত আপনার। সুন্দর দেশ।'

'তা লাভ কেমন হলো, বাবা?'

'ভালোই। ওখানেই থাকবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'কিন্তু জংলীরা?'

কাঁধ ঝাঁকালাম। 'ভালো লোকের সাথে ভালো ব্যবহার করবো। আর যদি যুদ্ধ করতে চায়, তাই সই। ব্যবসা করবো ওদের সঙ্গে, অবশ্যি এতে ঝুঁকি আছে জানি। তবে দুটো জাতি যখন মুখোমুখি হয়, যারা বেশি কর্মদক্ষ তারাই টিকে যায়—এটাই জীবনের রীতি।

'ইনডিয়ানদের গর্ব তাদের কুটিরশিল্প এই গর্ববোধ নষ্ট করে দেয়া

উচিত হবে না। তাহলে ওরা কাজকর্ম করবে না, পরনির্ভর হয়ে পড়বে।'

ঘাড় কাত করে সায় দিলেন হ্যাসলিং। 'কিন্তু কজন তোমার মতো করে ভাবে, বলো? তা কবে নাগাদ তুমি ওঁর হদিস জানতে পারবে বলে মনে করো? কী করবে, কিছু ভেবেছো?'

'উদ্ধার করে নিয়ে আসবো।'

হুঁশিয়ার থাকতে হবে তোমাকে। রাজদরবারে রুপার্ট গেনেসটা-রের লোক আছে, তাছাড়া ও বোকা নয়। ধরো আর্লকে উদ্ধার করে আনলে তুমি এবং তোমার কাছে মারা গেলেন উনি। তখন?'

এই চিন্তাটা আমার মাথায় আসেনি আগে।

'বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই কী বলতে চাইছি? গেনেসটারের ডবল লাভ হবে। বুড়োও মরলো, এবং অপহরণের দায়ে জেলে গেলে তুমি।'

'তবু আর কোনো উপায় নেই। উনি আমার বাবার বন্ধু এটাই সব চেয়ে বড় কথা।'

'শোনো,' শান্ত গলায় বললেন হ্যাসলিং, 'বুঝতে চেষ্টা করো। তুমি চলে যাবার পর থেকে পরিস্থিতি বদলে গেছে। তোমার বন্ধুই কেবল অসুস্থ হয়ে পড়েননি, রুপার্ট গেনেসটারও কাজ গুছিয়ে নিয়েছে অনেক। লোকটা চাটুকারের চূড়ান্ত, রাজদরবারে এইভাবে নিজের অবস্থান পাকা করে নিয়েছে। কোনো দলাদলিতে যোগ দেয়নি, অথচ সবার উপকার করেছে। ফলে প্রত্যেকের সাথেই ওর খাতির।'

থামলেন হ্যাসলিং। 'তোমার জন্যে সব দরজা বন্ধ করে দিয়েছে ও। ইচ্ছে করে নয়—কারণ ও ধরেই নিয়েছিল তুমি আর ফিরতে পারবে না।

'ব্রায়ান টমাসও সাহায্য করতে পারবেন না। গেনেসটারের উস-কানিতে বিপদে জড়িয়ে গেছেন উনি। রানী তোমার গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন। টমাস নিজেও যে-কোনো মুহূর্তে গ্রেফতার হয়ে যেতে পারেন। আর তুমি যদি একবার কারাগারে যাও, বন্ধু, জীবনে আর বেরুতে পারবে না।'

'ভোরে নেদারল্যানডসের জাহাজ ছাড়ছে,' বললো জুবলেন, 'ক্যাপটেন আমার পরিচিত। কেউ টের পাবার আগেই আমরা সরে পড়তে পারবো।'

'ঠিক,' বললেন হ্যাসলিং। 'রানীর মনোভাব বদলে যেতে বাধ্য। উনি অসম্ভব বুদ্ধিমতী। গেনেসটার বেশি দিন বোকা বানাতে পারবে না।'

কিন্তু আমার দুশ্চিন্তা কাটলো না। প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কীভাবে তাদের শত্রুদের নিধন করেন তার অনেক কাহিনী আমি শুনেছি। তাছাড়া রানীকে যতটুকু বলা হবে ততটুকুই জানছেন তিনি। সুন্দরী রুচিবান মহিলা, শাসক হিশেবে অতুলনীয়—কিন্তু তাই বলে তো এক সাথে সব জায়গায় হাজির থাকতে বা সব ঘটনা নিজে তদন্ত করতে পারবেন না। উপদেষ্টাদের ওপর নির্ভর করতে হয় তাঁকে—এবং ওদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব লাইন লবি আছে।

রুপার্ট গেনেসটারের এমন বন্ধু আছে যা আমার কোনো দিন হবে না। আর পারিবারিক সুনামের কারণেও কিছু অনুগত লোক পেয়েছে সে। ওর জন্ম অভিজাত কুলে, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

'বেশ,' অবশেষে বললাম, 'যাবো নেদারল্যানডস। তবে তার আগে এক জায়গায় থামবো।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকলো করনিভো, সাথে পিটার টালিস।

'আবার তাহলে দেখা হলো আমাদের,' বললো টালিস। 'তো ওই চার্টগুলো কাজে এসেছিল?'

'হ্যাঁ। আর্লের খোঁজ বের করতে চাইছি আমি। যদ্দূর শুনেছি সমুদ্রের ধারেকাছে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'তাহলে আমার তথ্য ঠিক,' বললো টালিস। 'লনডনের দক্ষিণে একটা গভীর উপত্যকা আছে, চেনো?'

'না,' বললাম।

'আমি চিনি,' বললো জেরেমি। 'কৈশোরে প্রায়ই বেড়াতে যেতাম।'

'একটা প্রাচীন দুর্গ আছে ওখানে—সুরক্ষিত। দুশো বছরের পুরোনো—কোন এক নিঃসন্তান ব্যারনের। আর্লকে ওই দুর্গে নিয়ে গেছে গেনেসটার।'

'হতে পারে,' চিন্তিত গলায় বললো রিং, 'ওই দুর্গটাও আমি চিনি। চোদ্দ শতক বা তারও আগের।'

'আমিও,' বললো জুবলেন।

'শুনেছি ওখানে তাঁকে নিয়ে গেছে ওরা,' বললো টালিস। 'গেনেসটারের দুই খাস চাকর আর আর্লকে পাহারা দেয়ার জন্যে কয়েকজন গার্ড আছে।'

'জায়গাটা কী উপকূলের কাছেপিঠে?' শুধোলাম আমি।

'মাইলকয়েক দূরে। নদীপথে যেতে হয়। অন্তরীপের আগে।'

'আমরা যাবো। জুবলেন, তুমি ডিঙি নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে ভাটিতে অন্তরীপ পর্যন্ত যাবে, তারপর ঘুরে উজানে রওনা দেবে। করনিভো থাকবে তোমার সাথে।'

'আমাকেও নিয়ে চলো,' বললেন হ্যাসলিং।

'না,' বললাম আমি। 'এখানে আর্লের এমন কোনো বিশ্বস্ত বন্ধু আছেন যাঁকে গেনেসটার দলে টানতে পারেনি?'

'আছে। প্রভাবশালীও বটে।'

'তাহলে ওঁর সাথে দেখা করে সব ব্যবস্থা পাকা করে রাখুন। আর্লকে ওখানেই রাখবো।'

'তুমি কী করবে?' হ্যাসলিং জানতে চাইলেন।

'আমি রিংকে নিয়ে স্থলপথে যাবো।' টালিসের পানে তাকালাম। 'ঘোড়া লাগবে। পারবে জোগাড় করতে?'

'এটা কোনো সমস্যাই নয়। আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।'

'না। তুমি আমার মালপত্র বিক্রি-বাট্টার ব্যবস্থা করো। আমেরিকায় যেতে হলে আমাদের টাকা আর একটা জাহাজ লাগবে। কেন জানি মনে হচ্ছে শিগগিরই ইংল্যানড ছাড়তে হবে আমায়।

'তবে,' যোগ করলাম, 'ফারের চালান পাঠাবো। তোমার সম্পর্কে ক্যাপটেন টমাসের সাথে আমার কথা হয়েছে। এখন তুমি রাজি হলেই হয়।'

'রাজি।'

আরো কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপারে আলাপ হলো, তারপর সবাই কাজে নেমে পড়লো। আমি ঘরে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র গুছিয়ে নিলাম।

ম্যাগি দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালো। 'খিদে পাবে, ওই টেবিল থেকে খাবারগুলো নিয়ে যেও।'

'ওরা যদি এখানে আসে, ম্যাগ,' আমি বললাম, 'আমাদের ব্যাপারে কিস্সু জানো না তুমি। একটা রাত কাটিয়ে চলে গেছি। আমাকে লোক সুবিধের বলে মনে হয়নি তোমার, তাই চলে যাওয়ায় খুশি হয়েছো।'

ওর হাতে একটা গিনি দিলাম। 'আর আমার বন্ধুদের কেউ এসে সাহায্য চাইলে এইটে দিও।'

অন্ধকার রাস্তা ধরে ছুটে চলেছি আমি আর জেরেমি রিং। বোকার মতো ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছি, এমন একজনের সাহায্যে যাকে আমরা কেউই চিনি না। উনি আমার বাবার সাথে একত্রে যুদ্ধ করেছেন, বাবা একবার প্রাণ বাঁচিয়েছেন তাঁর কিন্তু তাঁকে কখনো দেখিনি। জেরেমি রিংও নয়।

ও যাচ্ছে তার কারণ ও জেরেমি রিং মানবতায় বিশ্বাসী, সৈনিক-বেশে কবি—জীবনের অর্থ ওর কাছে নির্ভীকতা, কাপুরুষতা নয়। অন্য ক্ষেত্রে নিজের সুযোগ হারিয়েছে, এখানে হারাতে চায় না।

একটা টিলার মাথায় পৌঁছে ঘোড়াদুটোকে বিশ্রামের সুযোগ দিলাম আমরা।

'জেরেমি,' বললাম আমি, 'এই কাজ থেকে বেঁচে ফিরতে পারলে আমরা আমেরিকায় যাবো। তুমি যাবে?'

'হ্যাঁ···তুমি গেলে···'

আবার ছুটে চললাম। রেবেকার কথা মনে পড়ছে। চোখের সামনে ভাসছে আমাদের প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতি, থিয়েটার থেকে পালিয়ে ওদের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলাম আমি।

জাহাজে যে সব জল্পনাকল্পনা হয়েছে আমাদের দুজনের মাঝে, সেগুলোর কথা ভাবতে লাগলাম।

অন্ধকার বনভূমির ভেতর দিয়ে ছুটছি, বাতাসে ভেজা মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ পারিজাতের সুঘ্রাণ ভাসছে, খুরের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলেছে নীরব প্রকৃতিতে।

আর্লের শরীরের প্রকৃত অবস্থা কী আমরা কেউই জানি না। গেনেসটার কী তাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত করতে চায়?

উনিশ

জেরেমি রিং আমার চেয়ে দক্ষ ঘোড়সওয়ার, আমি হাঁটতে অভ্যস্ত বেশি। উপরন্তু সে রাস্তাঘাট চেনে।

কেউ যাতে অনুসরণ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে বলেছি জেরেমিকে। তাই নানান গলিঘুঁচি ধরে চলছে।

'তুমি দেখছি পথঘাট বেশ চেনো,' কণ্ঠস্বরে ঈষৎ সন্দেহের ছোঁয়া মিশিয়ে বললাম।

ও হাসলো। 'তাই তো চেনা উচিত, দোস্ত। বহুবার ছিনতাই করেছি এই দিকে। অবশ্যি তুমি ছাড়া অন্য কারো কাছে স্বীকার করবো না সেটা।'

আর্দ্র ঠাণ্ডা রাত। লনডন ছাড়িয়ে অনেক দুর চলে এসেছি, ধীরে ধীরে চলছি এখন। আমাদের সামনে একটা ছোট উপত্যকা, তার-পর গ্রাম।

'আমার এক পরিচিত লোকের সরাইখানা আছে ওখানে,' বললো রিং। 'ওর হাতে নগদ কড়ি গুঁজে দিলে তাজা ঘোড়া পাওয়া যাবে, এবং ব্যাপারটা ভুলে যাবে সে।'

সরাইটার নাম সেভেনওকস। গাছ আছে, তবে কোনো ওক চোখে পড়লো না। কয়েক টুকরো ঠাণ্ডা হ্যাম আর রুটি খেয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা। ভোরে একজোড়া বে ঘোড়ায় পুব দিকে রওনা হলাম, কিছু দূর গিয়ে ফের বাঁক নিয়ে দক্ষিণের পথ ধরলাম। গাঁয়ের লোকদের চোখে ধুলো দেয়ার জন্যেই জেরেমি এই কৌশলের আশ্রয় নিলো।

বেলা চড়ে গেছে, তাপ ছড়াচ্ছে সূর্য, আমাদের গন্তব্য এখনো কিছুটা দূরে রয়েছে। গভীর বনের ভেতর করাতিদের একটা পরিত্যক্ত কুটিরে বিশ্রাম নিতে থামলাম। রাত নামার আগে আর রওনা হবো না। পাশেই পাতকুয়ো আর একটা প্রাচীন দালানের ভাঙা ইটকড়ি-বর্গা পড়ে রয়েছে। পর্ণরাজির ফাঁক দিয়ে আধমাইল দূরে দুর্গের কাঠামোটা চোখে পড়ছে।

সন্ধ্যের পর গাছপালার ভেতর দিয়ে ঘোড়াদুটোকে হাঁটিয়ে নদীর পাড়ে নিয়ে গেলাম। জায়গাটা ঘন উইলো ঝোপে ঘেরা। পানি খাওয়ার সুযোগ দিলাম ওদের।

সহসা, ক্ষীণ শব্দ ধরা পড়লো কানে। ঝোপের পাশ দিয়ে কেউ হেঁটে আসছে। লোকটা যেই হোক, সাবধানে পা ফেলছে।

তারপর ম্লান আলোয় ওকে দেখতে পেয়ে আমি কথা বললাম।

'এসো।' লোকটা জবলেন। 'জানতাম তুমি থাকবে এখানে।' আমাদের দিকে এগিয়ে এলো সে।

'ডিঙি নদীর ওই তীরে বাঁধা আছে। আরো সামনে নিয়ে যাবো?'

'হ্যাঁ। করনিভো কই?'

'সাকিমের সাথে ডিঙিতে অপেক্ষা করছে। সাকিম না থাকলে এত শিগগির পৌঁছুতে পারতাম না। ও খুব ভালো সেইলর।'

'তাই। ওকে ডিঙিতে রেখে তুমি আর করনিভো আমার সঙ্গে

এসো।'

'দুর্গের ঠিক নিচেই একটা উঠোনমত আছে। ওখানে আসবো?'

'এসো, এবং তাড়াতাড়ি। যা করার দ্রুত এবং নিপুণভাবে সারতে হবে।' এক মুহূর্ত বাতাসে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম। 'তোমাদের সাথে উঠোনে মিলিত হবো। জলদি এসো।'

ও চলে যেতে জেরেমিকে নিয়ে আবার বনের পথ ধরলাম আমি। একটু বাদে দুর্গের প্রায় নাকের ডগায় চলে এলাম। আমাদের ডানে কালো টলটলে জল, বাঁয়ে ফিতের মতো একটা মেঠো পথ চলে গেছে উঠোন অবধি।

বনের বেশ খানিকটা ভেতরে ঘোড়াগুলো বেঁধে করনিভো আর জুবলেনের অপেক্ষায় রইলাম। সাকিমকে নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা নেই। সম্ভবত ওই আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বুদ্ধিমান, কখনো অসতর্ক থাকে না। এক সারিতে এগিয়ে গেলাম আমরা।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। মিটমিটি তারা জ্বলছে আকাশে, তাও বেশির ভাগ ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে। অল্প অল্প ঠাণ্ডা পড়েছে, দূরে কোথাও বৃষ্টি হয়ে থাকবে। চারদিক নীরব। ভাঙা পাঁচিল টপকাতেই একটা দরজা পড়লো। তালা দেয়া। তালাটা নেড়েচেড়ে দেখার সময় আমার হাতে মাকড়সার জাল লেগে গেল। অব্যবহৃত দরজা, বোঝাই যাচ্ছে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ভেতর থেকে।

আশপাশে পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। শ্যাওলা জন্মেছে গায়ে, দেয়াল থেকে আঙুরলতা ঝুলছে। দুর্গের পেছন দিকে গেলাম আমরা।

জেরেমি আমার কাঁধে হাত রাখলো। 'আমার পছন্দ হচ্ছে না ব্যাপারটা,' ফিসফিস করে বললো। 'ফাঁদ বলে মনে হচ্ছে।'

'ঠিক, তবে আর্লকে উদ্ধার করতে এসেছি, কাজ শেষ না করে

নড়ছি না।'

'ওই যে আস্তাবল দেখা যাচ্ছে,' চাপা স্বরে বললো করনিভো। 'দাঁড়াও, আসছি এক্ষুণি।' গিয়েই ফিরে এলো সে। 'বাইরে একটা টাঙা দাঁড়িয়ে আছে। আস্তাবলে বারোটা ঘোড়া এখনো কয়েকটার গা ঘামে ভেজা। গত একঘণ্টায় জোর ধকল গেছে ওদের।'

'বারোটা? গাড়ি টানার জন্যে চারটে, বাকি আটটা বোধ হয় যারা বাইরে থাকবে তাদের জন্যে। ওরা খুব সম্ভব আট-দশজন হবে।'

'নেহাত কম নয়,' চিন্তিত স্বরে বললো রিং।

'হ্যাঁ। তো আর দেরি করা সঙ্গত হবে না। তোমাদের প্রত্যেকের ভাগে একজন করে পড়বে, চাই কি কপাল ভালো থাকলে দুজনও হতে পারে।' হাসলাম আমি। 'ওরা সম্ভবত আমাদের জন্যে ওত পেতে রয়েছে। সে-ক্ষেত্রে আর বসিয়ে রাখতে চাই না ওদের। আশা করি রুপার্ট গেনেসটারকেও পাবো।'

এক কদম এগিয়ে থমকে দাঁড়ালাম আমি। 'জেরেমি, তুমি আর করনিভো পরে এসো। আমি আর জুবলেন আগে ঢুকবো। এর ফলে সবাইকে এক সাথে ফাঁদে পড়তে হবে না।'

সিঁড়ির ধাপগুলো টপকে দোরগোড়ায় পৌছুলাম আমরা, জুবলেন কপাটের গায়ে হাত রাখলো। আমার ইশারা পেয়ে খুলে দিলো, ভেতরে পা রাখলাম আমি। দরজায় কোনো তালা বা হুড়কো নেই, তার মানে আমরা এখানে প্রত্যাশিত। জুবলেন অনুসরণ করলো আমাকে।

বিশাল প্রবেশ পথটা অন্ধকার, ছায়াচ্ছন্ন। একটা বন্ধ দরজার নিচ দিয়ে ক্ষীণ আলো আসছে। দ্রুত পা বাড়ালাম আমি এবং ঠিক

সেই মুহূর্তে আমাদের পেছনে ফটকটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল, এক সাথে জ্বলে উঠলো কয়েকটা টর্চ।

আমরা একটা বিরাট হলঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি, প্রায় দশ-বারোজন লোক ঘিরে ধরেছে, প্রত্যেকের হাতেই খোলা তলোয়ার।

সামান্য আগে বাড়লো একজন। 'জানতাম, ওসমান, তুমি আসবে। যা হোক, তাড়াতাড়ি এসে পড়েছো তোমার যমদূতের কাছে।'

'আলবত। আর কতক্ষণ তোমাকে বসিয়ে রাখি বলো?'

'ফটক বন্ধ করে দিয়েছে,' শান্ত গলায় বললো জুবলেন।

'ভালোই করেছে, একজনও প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে না আমাদের হাত থেকে। ওই দেড়েলের প্রতি নজর রাখো, জুবলেন। ওর নাম গ্যারি লিনেকার, আগের ভুলটা শুধরে নিতে চাইছে।'

ওরা এগিয়ে আসার চেষ্টা করতেই তলোয়ার বের করলাম আমি। 'আশা করি আর্ল বেঁচে আছেন এখনো? নাকি তুমি মেরে ফেলেছো?'

কাঁধ ঝাঁকালো গেনেসটার। 'এমনিতেই মরবে বুড়ো···তাড়াহুড়োর কী আছে? ওর শরীরে আমি কোনো দাগ দেখতে চাই না, তবে তোমার···?'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। তা দেখো, এ-বারেও যেন মাটিতে গড়াগড়ি যেও না আবার।'

রাগে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলো সে, আধকদম আগে বাড়লো। আমি আস্তে আস্তে নাচাতে লাগলাম তলোয়ারটা, মুখে হাসি। 'তুমি মেয়েছেলেরও অধম। সে-দিন ভদ্রমহিলা পানি খেতে চাওয়ায় কী কাণ্ডটাই না করলে।'

'এখন তোকে খুন করবো,' হিস হিস করে উঠলো সে।

'একাই ? না তোমার এই পা-চাটা কুকুরগুলোকে দায়িত্ব দেবে ?' মাথার ওপর আঁচড় কাটার ক্ষীণ শব্দ পেলাম। পাথরের ওপর হাঁটছে কেউ ? কী আছে ওখানে ? তাকাবার সাহস হলো না আমার।

'তিলে তিলে মারো ওকে!' বললো গেনেসটার।

'আর তুমি, রুপার্ট। তোমার ওই সুন্দর ছাগল-দাড়ির ঠিক নিচেই তলোয়ারটা ঢুকিয়ে দিতে চাই আমি।'

'ওকে ধরো।' বলেই ঘুরে দাঁড়ালো সে।

ওরা এগিয়ে এলো, তবে প্রথম সুযোগটা আমিই নিলাম। আমার তলোয়ারের নাগালের ডগায় ছিলো একজন, ও এগিয়ে আসতেই চকিতে সামনের দিকে লাফ দিলাম আমি। ধাতব পদার্থে ঘষা খাওয়ার তীক্ষ্ণ শব্দ হলো একটা, তারপর ঘ্যাচ করে ওর বুকে একহাত পরিমাণ গেঁথে গেল তলোয়ারটা।

ফ্যালফ্যাল করে আমার পানে চেয়ে রইলো সে, দৃষ্টিতে মৃত্যুর ছায়া স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এক ঝটকায় তলোয়ারটা ছাড়িয়ে নিলাম, তারপর শুরু হয়ে গেল তুমুল লড়াই।

ওপর থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো, পরক্ষণেই দড়ি বেয়ে নিচে নামলো করনিভো আর জেরেমি।

কাটল্যাস উঁচিয়ে একজন তেড়ে এলো আমার দিকে, জাহাজের ডেকে এধরনের আক্রমণ সফল হতে পারে, কিন্তু এখানে নয়। আমার তলোয়ার নামানো ছিলো, দ্রুত ওপরে উঠিয়ে আনলাম। হাঁ হয়ে গেল ওর চোয়াল—ঠিক এই মারটাই আমি মনে মনে গেনেসটারের জন্যে ভেবে রেখেছি।

ছুটো খতম। আমার শার্ট ছিঁড়ে গেছে। মরণপণ লড়াই চলছে, ডানে বাঁয়ে সমানে আঘাত হানছি আমি।

করনিভো পড়ে গেছে…না, আবার উঠে দাঁড়ালো। রক্ত লেগে আছে শার্টে। নাচানাচি করছে টর্চের আলো, ঘামে চকচক করছে সব মুখ।

একটা লম্বা লোক ধেয়ে এলো আমার দিকে। একপাশে সরে গিয়ে আমি তলোয়ার উঁচু করে ধরলাম। দুটো তলোয়ার আটকে গেল পরস্পর।

বাঁ হাতে ওর পেটে ঘুসি মারলাম আমি, হাঁসফাঁস করে পিছিয়ে গেল ও। এগিয়ে গিয়ে আবার মারলাম…অপ্রত্যাশিত মারে হকচকিয়ে গেল ডার্কলিং।

ফের পিছিয়ে গিয়ে পজিশন নিতে চেষ্টা করলো, কিন্তু আমি সুযোগ দিলাম না, তলোয়ারটা বাঁয়ে ঘুরিয়ে ওর ওপরের ঠোঁট দুটুকরো করে ফেললাম, মাড়ি বেরিয়ে পড়লো। পরমুহূর্তে ডানে ঘোরাতেই চোখের নিচে গাল কেটে গেল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর জামাকাপড়, ল্যাজ গুটিয়ে পালালো ডার্কলিং, আমি অন্যদিকে মনোনিবেশ করলাম।

আবার তলোয়ারের খোঁচায় আমার শার্ট ছিঁড়ে গেল, তারপর আমরা কোণঠাসা হয়ে পড়লাম—আমি আর জুবলেন। করনিভোর কী হয়েছে জানি না। তিনজনের সাথে একা লড়ছে জেরেমি। চিৎকার করে লুটিয়ে পড়লো একজন, এবং জেরেমি চকিতে উবু হয়ে আরেকটার পা কচুকাটা করলো।

হঠাৎ বাইরে থেকে ঘন ঘন আঘাত পড়তে লাগলো ফটকের পাল্লায়। চিৎকার ভেসে এলো একটা। জেরেমি দ্রুত একধারে সরে গিয়ে হুড়কোটা নামিয়ে দিলো, সশব্দে খুলে গেল দরজা।

ক্যাপটেন টমাস। সঙ্গে চারজন লোক।

শত্রুরা এ-বার খোলা দরজা দিয়ে পিঠটান দেবার চেষ্টা করলো। জোর লড়াই শুরু হলো ওখানে। গেনেসটার যে-দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়েছে, একটা লাশ টপকে আমি সে-দিকে দৌড়ে গেলাম।

পাল্লাটা আস্তে ঠেলা দিতেই ছোট্ট ঘরটার ভেতর কান ফাটানো আওয়াজে একটা পিস্তল গর্জে উঠলো। কিন্তু আমি আগেই এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছিলাম বলে ক্ষতি হলো না কোনো। ভেতরে ঢুকে গেনেসটারকে দেখতে পেলাম।

আর্ল—অন্তত আমার তাই মনে হলো ওঁকে--বিছানায় বসে আছেন, পাশে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে, ক্রুদ্ধ চেহারা। আমার মাথা লক্ষ্য করে সদ্য-খালি পিস্তলটা ছুঁড়ে মারলো গেনেসটার, তারপর খাটের ও-পাশ দিয়ে ঘুরে তেড়ে এলো।

মরিয়া হয়ে উঠেছে ও, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, চোখদুটো প্রতিশোধস্পৃহায় জ্বলছে ধিকিধিকি। লোকটা আর যাই হোক, ভীরু নয়, স্বীকার করতে বাধ্য হলাম। তলোয়ার উঁচিয়ে তৈরি হয়ে আছে।

'তুই মুখ খোলার জন্যে বেঁচে থাকলেও,' বললো সে, 'কেউ বিশ্বাস করবে না তোর কথা। আমি বলবো তুই খুন করেছিস আর্লকে।'

'কিন্তু উনি তো মারা যাননি।' বললাম। 'আমি…'

তলোয়ারটা সামান্য নিচু করলো সে। হঠাৎ বাঁ হাতে ছোরা বের করে বৃদ্ধকে মারতে উদ্যত হলো।

আমি সামনে লাফ দিলাম।

ওর বুকের মাঝখানে আমার তলোয়ারের ফলা ঢুকে গেল, বাঁয়ে মোচড় দিলাম।

বিস্ফারিত চোখে তাকালো সে, রক্তশূন্য ঠোঁট। 'ভুল হয়ে গেছে!

আগেই…' শ্বাসকষ্টে হাঁপিয়ে উঠলো গেনেসটার।

আমি তলোয়ারটা বের করে নিতে হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল ও। মুঠি ঢিলে হয়ে ছোরাটা খসে পড়লো।

'মাফ করবেন, একসেলেনসি,' আমি বললাম। 'এই অনধিকার প্রবেশের জন্যে দুঃখিত…আমার নাম অ্যালান ওসমান।'

'তুমি কে আমি জানি,' ছোট্ট ঘরটায় বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর দূরবর্তী মেঘ-গর্জনের মতো শোনালো। 'হুবহু বাপের মতো।'

'ঈশ্বরের দিব্যি,' বললেন তিনি, আরেকটু সোজা হয়ে বসলেন, 'এত নির্ভুল অ্যাকশন আমি কখনো দেখিনি।'

সহসা খেয়াল হলো গ্যারি লিনেকার সটকে পড়েছে…ওর কথা ভুলে গিয়েছিলাম আমি।

ওর পিছু ধাওয়া করতে রওনা হলাম, কিন্তু বৃদ্ধ হাত নেড়ে বারণ করলেন। 'যেতে দাও।'

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলো ওরা। সবার আগে জুবলেন, হাতে তলোয়ার, তারপর জেরেমি রিং আর সাকিম। সবশেষে ক্যাপটেন ব্রায়ান টমাস।

টমাস দ্রুত ওঁর শিয়রের কাছে গেলেন। 'কেমন আছেন, স্যার রবার্ট? চোট লাগেনি তো কোনো?'

'না,' বললেন স্যার রবার্ট, 'তবে ভীষণ অসুস্থ বোধ করছি। এই গার্টা না থাকলে মারা যেতাম এতক্ষণে। এখন তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো আমাকে।'

'আমাদের কাছে শুধু ঘোড়া রয়েছে,' প্রতিবাদ জানালেন টমাস।

'আমাদের ডিঙি আছে,' বললাম। 'সাকিম? স্যার রবার্টকে আরামে নেয়ার ব্যবস্থা করা যাবে না?'

'আলবত যাবে।'

ওর পানে তাকালেন স্যার রবার্ট। 'মুর, তাই না? তোমাদের অনেকের সাথে লড়েছি আমি।'

হাসলো সাকিম, ওর শাদা নিখুঁত দাঁতগুলো আধো-অন্ধকারে ঝিকিয়ে উঠলো। 'আমি তাদের একজন নই বলে আমার খুশি লাগছে, স্যার রবার্ট।'

এ-বার শব্দ করে হাসলেন আর্ল। 'আমারও। টমাস, পালকির ব্যবস্থা করো। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে চাই না আমি।'

বিশ

লনডনে নিজের বাসায় বিশাল পালঙ্কে উঁচু তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছেন স্যার রবার্ট দুর্গের ওই ঘটনার পর দুহপ্তাও পেরোয়নি, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসে গেছে।

রেবেকাকে নিয়ে ক্যাপটেন ব্রায়ান টমাসও উপস্থিত রয়েছেন। গম্ভীরভাবে বসে রয়েছে ও, হাত দুখানা কোলের ওপর জড়ো করে রেখেছে।

'আমি কথা বলেছি ওর সঙ্গে, কিন্তু শুনতে চাইছে না।'

স্যার রবার্ট ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। 'ওর বাবাও রগচটা মানুষ ছিলো,' বললেন তিনি, তারপর যোগ করলেন, 'তবে,

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, খুব সাহসী ছিলো, ভয়ডর কী জিনিস জানতো না।'

'প্রস্তাবটাকে আমি মোটেও ছোট করে দেখছি না,' বললাম। 'কিন্তু আমার জন্মই হয়েছে অ্যাকশনের জন্যে। আমি পরের দানে আরাম করতে চাই না। এই দুবাহুতে যথেষ্ট শক্তি আছে উপার্জনের মতো। আর ওই দেশেই আমার এবং আমার পরিবারের অদৃষ্ট নির্ভর করছে।'

'সেই থেকে পরিবার পরিবার করছো,' ঈষৎ রূঢ় সুরে বললেন স্যার রবার্ট, 'অথচ এ-সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। তুমি বিবাহিত?'

'না।'

'তাহলে আবার পরিবার এলো কোত্থেকে?'

'হবে। এবং আমি চাই না যে আমার সন্তানেরা অভিজাত কুলে জন্ম নয় বলে সুযোগের অভাবে মাথা কুটে মরুক।'

'তুমি ইংল্যানডকে অবহেলা করছো?'

'না না। এখানে প্রচুর সুযোগ রয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে আছে হাজারো বিধিনিষেধ। ওইটি আমি মেনে চলতে নারাজ।'

'তাহলে আমেরিকায় যাবেই?'

'হ্যাঁ। ওখানে আমি নিজের আবাস গড়বো।'

'ঠিক আছে স্যার ওঅলটারের সঙ্গে কথা বলবো আমি।'

'না, স্যার রবার্ট। আমি একাই যাবো, আর যদি কোনো বন্ধুবান্ধব যেতে চায়, যাবে।'

প্রথমে আমার, তারপর রেবেকার দিকে তাকালেন স্যার রবার্ট। 'মেয়েটা কে? ইংল্যানড ছেড়ে ওই জঙ্গলে গিয়ে থাকতে রাজি হবে কেউ?'

'আমার ধারণা—হবে,' বললাম আমি, 'তবে আগে আমাকে একটা বাড়ি বানাতে হবে ওখানে।'

রেবেকা তাকালো। 'আর এই মাঝের সময়টুকু কী হবে অ্যালান?'

আমার মুখ আরক্ত হয়ে উঠলো। 'আমি…আমি…'

অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে সরাসরি আমার পানে তাকালো রেবেকা—প্রথম সাক্ষাতের রাতে ওর এই দৃষ্টি দেখেছিলাম। 'তেমন কোনো মেয়ে যদি থেকে থাকে, তার বাড়ির জায়গা তাকেই নির্বাচন করার সুযোগ তোমার দেয়া উচিত। তুমি যদি আদৌ তেমন মেয়ে খুঁজে পাও, আমার বিশ্বাস, সে তোমার পাশে পাশে থাকতে চাইবে সর্বদা।'

'কিন্তু জংলীদের ভয় আছে।'

'জানি।'

'ওখানে কোনো ঘরবাড়ি নেই, গুহা বা ছনের কুটিরে থাকতে হবে।'

'তাও জানি।'

'কিন্তু একটা মেয়েকে আমি কীভাবে…'

'তোমার চেয়ে বোধহয় কম সাহসী বলে মনে করো তাকে, তাই না? বুঝতে পারছি আসলে আমাদের, মেয়েদের, ঠিক চেনো না তুমি, অ্যালান।'

'নিঃসঙ্গ বোধ করবে সে।'

'বেশি দিন নয়, নিশ্চয়ই। তোমাকে দেখে যা মনে হয় তার অর্ধেক যোগ্যতাও যদি তোমার থেকে থাকে, অচিরেই নতুন নতুন মুখ আসবে। আমি বলি কি, অ্যালান, যাবার আগে সেই মেয়ের সাথে সরাসরি একবার কথা বলো তুমি। একটা বছর তুমি থাকবে না… বড্ড লম্বা সময়।'

'আ…আমি…'

স্যার রবার্টের দিকে ঘুরে ক্ষমাপ্রার্থনা করলো ও। 'স্যার রবার্ট, অনুমতি দিলে আমি এখন যেতে পারি। পরিকল্পনার সব ভার আপনাদের, পুরুষদের, ওপরেই থাক। বিশেষত আপনারা যখন অন্যের ইচ্ছাঅনিচ্ছার মূল্য দেন না তখন আমার এখানে থাকা না থাকা সমান।'

দরজা বন্ধ হবার পর স্যার রবার্ট হাসলেন। 'খুব জেদী।'

'অবিকল ওর মায়ের স্বভাব পেয়েছে,' বললেন ব্রায়ান টমাস।

'আমার বউ সর্বদা আমার পাশে পাশে থাকুক,' বললাম, 'এটাই আমি চাই।'

'রেবেকার সাথে আলাপ করেছো এ-ব্যাপারে?' কায়দা করে আসল কথাটা জিজ্ঞেস করলেন টমাস।

'না, মানে…'

স্যার রবার্ট দ্রুত প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন। 'তাহলে তুমি যাচ্ছো?'

'হ্যাঁ, জাহাজ পেলেই রওনা দেবো।' একটু থেমে যোগ করলাম, 'স্যার রবার্ট, পশ্চিম দিগন্তে আমি বহু পাহাড় দেখেছি, দূরবিসারী নীল গিরি। আমাকে ওগুলো অতিক্রম করে দেখতে হবে ও-পারে কী আছে।'

'যাও, ওসমান, আমার বয়েসটা কম হলে আমিও যেতাম তোমার সাথে। ওই পাহাড়গুলোর পেছনে কী আছে দেখতে আমারও ভালো লাগতো।' থামলেন তিনি। 'ঠিক আছে, জাহাজের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি।' ঘন পাকা ভ্রূর নিচ দিয়ে তাকালেন আর্ল। 'অ্যাফটে একটা চমৎকার কেবিন আছে। ডাচদের তৈরি। মজবুত। কেবিনটা খুব সুন্দর—রাজা রানীর থাকার উপযুক্ত।'

'আমি নিজে একবার দেখবো জাহাজটা।'

'আচ্ছা, বাদবাকি দায়িত্ব তাহলে আমাদের রইলো।' ঈষৎ নড়ে বসলেন তিনি। 'তোমার ওই টালিসের সঙ্গে কথা বলেছি। চমৎকার লোক, অ্যালান। ভালো মুনাফা করেছে তোমার মাল বেচে।'

'ধন্যবাদ, স্যার রবার্ট।' বাইরে যাবার জন্যে আইঢাই করছে আমার মন। উনি বুঝে থাকলেও প্রকাশ করলেন না হাবভাবে। 'তাহলে, স্যার রবার্ট, ওই কথাই রইলো। আপনি আর ক্যাপটেন টমাস সব পরিকল্পনার দায়িত্ব নিলেন। আমার আবার একটু কাজ…'

'এসো।' হাসলেন বৃদ্ধ।

বাগানে ও অপেক্ষা করছে। চারপাশে লাল শাদা গোলাপ, কৃত্রিম ঝরনা থেকে অজস্র ধারায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে উৎসারিত জল। সবুজ ঘাসের গালিচা পেরিয়ে ওর কাছে গেলাম। আমার মুখোমুখি হলো সে।

'আমার জেদ খুব বেশি,' ও বললো।

'না,' বললাম। 'ওতে বরং আরো সাহস পাচ্ছি আমি।'

'একটা বছর থাকবে না তুমি, দীর্ঘ সময়। আমি অনেক মেয়েকে চিনি যাদের স্বামী সমুদ্রে বা যুদ্ধে গিয়ে আর কোনোদিন ফেরেনি। আমি চাই না আমার জীবনেও তাই ঘটুক।'

'তাহলে সত্যিই আসতে চাও?'

'তুমি যেখানে, আমিও সেখানে।'

'স্যার রবার্ট বললেন জাহাজের কেবিনটা নাকি খুব সুন্দর, রানীর উপযুক্ত।'

'হ্‌। ছেলেরা এ-সব ব্যাপারে ছাই বোঝে। এক্ষুণি গিয়ে দেখতে হবে আমাকে।'

'আমি ব্যবস্থা করে রাখবো।' ওর হাতে আলতো করে চুমু খেলাম। 'এখন তবে আসি, অনেক কাজ আছে।'

বাইরে আমার টাঙা দাঁড়িয়ে আছে। মেঘে-ঢাকা দিন। শানের ওপর চাকার ঘর্ঘর শব্দ তুলে এগিয়ে এলো টাঙাটা, কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়লো।

আবার আমেরিকায় যাবো। শিগগিরই আমার নিজের জাহাজ পশ্চিমে মহাসাগর পাড়ি দেবে, নিবিড় সবুজ বন আর নীলগিরির দেশে—ওখানে লাখো আশার ঝলকানি।

গদিতে হেলান দিয়ে বসলাম। ওই পার্বত্যাঞ্চলেই রয়েছে আমার অদৃষ্ট—তা সে যাই হোক, যেভাবেই আসুক।

রেবেকা তো আমার পাশে থাকছে।

স্থাপিত-২০০৬
সংগ্রহ নং........
তাং..../..../....
আলোকিত হও, আলো ছড়াও